ISSN 1605-2021

লোক-প্রশাসন সাময়িকী
Lok Proshason Samoeeky
সংখ্যা: ৪৫/No. 45
অগ্রহায়ণ ১৪১৪/December 2007

প্রাগৈতিহাসিক বাঙলার রাষ্ট্র ও প্রশাসনের উৎস সন্ধান

ড. মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর হোসেন*

Abstract: *This article aims at discovering the missing links and hidden roots of the lost state and administration of ancient Bangla. In this difficult journey, efforts have been undertaken to identify the primitive stages and characteristics of the evolutionary process of stateship in the region. By analyzing primary information received in this connection, an urge for wider search on ancient bureaucracy in the region became stronger and lateral efforts are undertaken to identify the specific stages and chronological development in this regard. Thus ideas on the then administrative structure, arrangement of administrative tires and its social links become evident.*

Folk literature is considered as a major source of information in this article for searching administrative links of prehistoric Bangla as because it is believed that the administration's relation with common people, its ability and intention to communicate with and power to influence them are imbedded in folk literature. Some instances regarding different tires of state and provincial administration, bureaucracy, employees' duty inside administration and hierarchy are taken from some Archaeological evidences. Vivid description and documentation of state and administrative structure of ancient Bangla, bureaucracy and mutual relation among people and state are found in some old historic books. Beside these, modern and dedicated historians, researchers and authors, in their works, have discussed issues of the ancient society, administration and lifestyle of the common people of Bangla. All these evidences, discussions, analysis and views are consulted in this article.

ভূমিকা

মহান মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে ১৯৭১ সালে পৃথিবীর মানচিত্রে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের অভ্যুদয় ঘটে। ত্রিশ লক্ষ শহীদ ও দু'লক্ষ মা'বোনের ত্যাগের বিনিময়ে অর্জিত স্বাধীনতা বাঙালি জাতির ইতিহাসে মহত্তম অর্জন। এ জন্য পাকিস্তানি শাসক চক্রের বিরুদ্ধে দুই যুগেরও বেশি সময় ধরে নিরন্তর রাজনৈতিক সংগ্রাম পরিচালিত হয়। সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক শোষণের বিরুদ্ধে সংগ্রামে অংশগ্রহণ করে সমাজের সর্বস্তরের শ্রেণি ও পেশার মানুষ। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে বাঙালির নিজস্ব আধুনিক রাষ্ট্র বাংলাদেশ বিশ্বের বুকে মাথা তুলে দাঁড়ায়।

তবে ১৯৪৭ সালে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শক্তিকে তাড়িয়ে বাংলাদেশ 'পূর্ব পাকিস্তান' নামে

* মহাপরিচালক, বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভ

আরো একবার স্বাধীন হয়েছিল। এর আগের ইতিহাস অবিভক্ত বা যুক্তবঙ্গের ইতিহাস। ইংরেজ শাসনামলের বেঙ্গল প্রেসিডেন্সি ছিল বর্তমান বাংলাদেশ (তৎকালীন পূর্ববঙ্গ) ও ভারতের আওতাধীন পশ্চিমবঙ্গ নিয়ে গঠিত।

১৭৫৭ সালে পলাশীর যুদ্ধের আগে নবাব সিরাজ-উদ-দৌলার শাসনাধীন বাংলা ছিল যুক্তবঙ্গ, বিহার ও উড়িষ্যাকে নিয়ে গঠিত। মোঘল সম্রাট আকবরের শাসনাধীন সুবে বাংলাও গঠিত ছিল একই সীমানা নিয়ে। পলাশীর যুদ্ধে ষড়যন্ত্রমূলক বিজয় অর্জনের মাধ্যমে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি এই বাংলার কর্তৃত্ব লাভ করে। বাঙলা, বিহার ও উড়িষ্যা নিয়ে যে জনপদ 'বাঙলা' নামে স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে পরিচিত ছিল তার মুখ্য জন বাংলা ভাষাভাষী বাঙালি জাতি। সে কালে বাঙালির সাংস্কৃতিক আধিপত্য বিস্তৃত ছিল পাটালিপুত্র ও ভূবনেশ্বর হতে কামরূপ পর্যন্ত। তবে প্রাচীন বাঙলার রাষ্ট্র ও প্রশাসনের শেকড় আরো গভীরে প্রোথিত। এর সূচনা প্রাগৈতিহাসিক কাল থেকে।

প্রাচীন বাঙলার রাষ্ট্র ও প্রশাসনের হারিয়ে ফেলা এ শেকড় সন্ধানের প্রচেষ্টা চালানো হয়েছে এ প্রবন্ধের পুরোটা জুড়ে। প্রাগৈতিহাসিক যুগের যে বাংলার কথা এখানে বলা হচ্ছে তার রাষ্ট্রীয় ও প্রশাসনিক ইতিহাসের প্রধান উপাদান লোকসাহিত্য। কিংবদন্তি, মহাকাব্যের কাহিনী ও বৈদিক সাহিত্য ছাড়াও ইতিহাসের উপাদান দেশীয় ও বিদেশী প্রাচীন সাহিত্যে বিভিন্নভাবে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। বিশেষত বৈদিক সাহিত্য, পুরাণ, মহাভারত, রামায়ণ, বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থ ও চর্যাপদ সাহিত্যে প্রাচীন বাঙলার প্রশাসন ও গণমানুষের সাথে তার সম্পর্ক, যোগাযোগ ও প্রভাব-সম্পর্কিত উপকরণ নিহিত আছে। এ কারণে এ প্রবন্ধের উল্লেখযোগ্য অংশ জুড়ে থাকবে প্রাচীন সাহিত্যের আলোচনা।

প্রাচীন সাহিত্যিক নিদর্শন ছাড়াও প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনের মাধ্যমেও বাংলার বিলুপ্ত প্রশাসনের ফসিল আবিষ্কারের প্রচেষ্টা চালানো প্রয়োজন। যেমন, বাংলাদেশের ওয়ারি-বটেশ্বরে প্রাচীন যুগের নগর সভ্যতার ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কার, পাহাড়পুর ও ময়নামতির মৃৎফলক, পুণ্ড্রনগরী বা মহাস্থানগড়ে প্রাপ্ত মৌর্যযুগের শিলালিপি, বর্ধমান ভুক্তিতে প্রাপ্ত মল-সারুল তাম্রশাসন লিপি, ফরিদপুর তাম্রশাসন লিপি, ভূমিদাস পট্টোলি, বিভিন্ন ভূমি ক্রয় বিক্রয়ের পাট্টা ইত্যাদি কিছু প্রত্যক্ষ প্রমাণের মাধ্যমেও বাংলার তৎকালীন রাষ্ট্রব্যবস্থা ও প্রশাসনিক কার্যক্রম সম্পর্কে ধারণা করা যায়। এ সবের মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় প্রশাসনের বিভিন্ন বিভাগ, আমলাতন্ত্র, প্রশাসনের অভ্যন্তরে কর্মচারীদের দায়িত্ব, স্তরবিন্যাস, জনগণের সাথে তাদের সম্পর্ক এবং পারস্পরিক যোগাযোগ সম্পর্কে আভাস পাওয়া যায়। তাই প্রত্নতাত্ত্বিক আবিষ্কার, খনন এবং প্রাচীন ইতিহাসের নানাবিধ উপকরণ ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়েছে এ প্রবন্ধে। আলোচনায় এসেছে প্রত্নতাত্ত্বিক আবিষ্কারগুলোর মধ্যে নিহিত সম্ভাবনার বিভিন্ন দিক।

সংস্কৃত ভাষায় রচিত বিভিন্ন গ্রন্থ, কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র, দণ্ডশাস্ত্র, শুক্রাচার্যের শুক্রনীতিসার, মনুসংহিতা, পালি ভাষায় রচিত বৌদ্ধ জাতক গ্রন্থসমূহ, শ্রীলঙ্কার প্রাচীনগ্রন্থ ও সাহিত্য, পরিব্রাজকদের বিবরণী, গ্রিক রাষ্ট্রদূত মেগাস্থিনিস, মিশর ও গ্রিসের বিভিন্ন ইতিহাসবিদ ও গ্রন্থকারের বর্ণনা এবং শীলভদ্রের জীবনীসহ বিভিন্ন প্রাচীন গ্রন্থ থেকে প্রাচীন বাঙলার রাষ্ট্র ও প্রশাসনিক কাঠামো, আমলাতন্ত্র, জনসাধারণের সাথে তার যোগাযোগ ও সম্পর্ক ইত্যাদি বিষয়ের ঐতিহাসিক বিবরণ পাওয়া যায়। এগুলো হচ্ছে প্রাচীন বাঙলার ইতিহাসের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক উপাদান। তাই অত্যন্ত সচেতনভাবে এসব গ্রন্থের আলোচনা, এগুলোর বিশ্লেষণ ও পর্যালোচনা সন্নিবেশিত হয়েছে এ প্রবন্ধে।

এছাড়া আধুনিক ও নিবেদিতপ্রাণ ঐতিহাসিক গবেষক ও লেখকগণ প্রাচীন বাঙলার সমাজ, প্রশাসন ও জনজীবনের বিভিন্ন বিষয়ের ওপর আলোকপাত করে নানা ধরনের গ্রন্থ প্রণয়ন করেছেন। প্রাগৈতিহাসিক ও প্রাচীন বাঙলার ধারাবাহিক ইতিহাস উদঘাটনে এসব গ্রন্থ মূল্যবান বিবেচিত হয়।[১] অকাতরে এ সব গ্রন্থের সহায়তা নেয়া হয়েছে প্রবন্ধে। সর্বোপরি প্রাচীন বাঙলার আমলাতন্ত্রের সূচনা বা উৎস উদঘাটনে প্রথমত প্রাপ্ত তথ্যাদি থেকে রাষ্ট্র বিকাশের প্রাথমিক পর্যায় ও বৈশিষ্ট্য চিহ্নিত করা, অতঃপর রাষ্ট্র বিকাশের ধারাবাহিক বিন্যাসের পরবর্তী পর্যায়সমূহ নির্দিষ্ট করে সে সময়ের প্রশাসনিক কাঠামো, স্তর বিন্যাস ও সামাজিক সম্পর্ক নির্ধারণ করার প্রচেষ্টাও চালানো হয়েছে।

প্রাচীন সাহিত্য ও বাঙলার জনপদ

পৃথিবীর প্রাচীনতম সাহিত্যিক নিদর্শন ঋগ্‌বেদে সরাসরি 'বঙ্গ' বা 'বঙ্গদেশ' সম্পর্কে কিছু উল্লেখ নেই। ঋগ্‌বেদ বৈদিক আর্যদের প্রাচীনতম রচনা। এ গ্রন্থের প্রাচীন মন্ত্রগুলি ২৫০০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দের রচনা, এ মত ইয়াকবি ও উইন্টার নিৎস-এর মতো প্রখ্যাত ইউরোপীয় পণ্ডিতরাও স্বীকার করেন।[২] গৃৎসমদ, বিশ্বামিত্র, বামদেব, অত্রি, ভরদ্বাজ, বশিষ্ট, কণ্ব, শৌনক, যম, ভৃগু, অঙ্গিরা, অথর্ব - প্রভৃতি প্রাচীন ঋষি ও ঋষিকারা বেদ রচনা করেন বৈদিক যুগে, আনুমানিক ১৮০০ বা ১৫০০ অব্দে যার সূচনা এবং ৬০০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দে তার সমাপ্তি। তবে সাধারণভাবে ১৮০০ বা ১৫০০ থেকে ১০০০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দ পর্যন্তই ঋগ্‌বৈদিক যুগ হিসেবে চিহ্নিত।

ঋগ্‌বেদে গঙ্গা নদীর কথা উল্লেখ আছে, বাঘের উল্লেখ নেই। প্রথমদিকে বাঘ্র সংকুল দক্ষিণবাংলার সাথে আর্যদের পরিচয় ছিল না এটা তারই প্রমাণ। তবে ঋগ্‌বেদে বাংলার প্রধান শস্য ধানের উল্লেখ আছে।[৩] গঙ্গা নদী এবং ধানের বিষয় ঋগ্‌বেদে উল্লেখের মাধ্যমে বঙ্গ এবং বঙ্গজন সম্পর্কে বৈদিক আর্যরা অবহিত ছিল একথা বুঝা যায়। তবে পরবর্তী বৈদিক সাহিত্যে[৪] ভারতবর্ষের প্রাচ্য জনপদ সম্পর্কে উল্লেখ আছে। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে এ জনপদের অধিবাসীদের পুণ্ড্র বা পৌণ্ড্র বলে উলে-খ করা হয়েছে। 'বঙ্গজন' ও জনপদ সম্পর্কে প্রথম উল্লেখ দেখা যায় ঐতরেয় আরণ্যকে।[৫] সেখানে একটি পদে বলা হয়েছে: 'বায়াংসি বঙ্গাবগধ্বাশ্চেয় পাদা' (২য়/১ম/১)। এ পদে বঙ্গ, বগধ, চের ও পাদা - এদের, 'বায়াংসি' অর্থাৎ কাক বা পক্ষী বিশেষ রূপে বর্ণনা করা হয়েছে।

---

১ বাংলার প্রাচীন ইতিহাস সম্পর্কে উল্লেখযোগ্য কয়েকখানা আধুনিক গ্রন্থ ক) বাঙ্গালার ইতিহাস, রাখালদাস বন্দোপাধ্যায়, খ) বাংলাদেশের ইতিহাস, ড. রমেশ মজুমদার, গ) বৃহৎবঙ্গ, দীনেশ চন্দ্র সেন, ঘ) বাঙালীর ইতিহাস, নীহাররঞ্জন রায়, ঙ) বাংলা ও বাঙালির বিবর্তন, ড. অতুল সুর, চ) ভারতবর্ষের ইতিহাস, আন্তোনোভা ও অন্যান্য, ছ) বাঙালির ইতিহাস, ড. মোহাম্মদ হাননান, জ) আদি বাঙালি: নৃতাত্ত্বিক ও সমাজতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ, অজয় রায়, ঝ) ভারত ইতিহাসের সন্ধানে, ড. দিলীপ কুমার গঙ্গোপাধ্যায়, ঞ) ভারত উপমহাদেশের ইতিহাস, এ কে এম শাহনেওয়াজ, ট) বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস, ড. এম এ রহিম।

২ দীলিপ কুমার গঙ্গোপাধ্যায় (২০০০), ভারত ইতিহাসের সন্ধানে, আদিপর্ব: প্রথম খণ্ড, সাহিত্যলোক, কলকাতা, পৃ. ১০১।

৩ ঐ, পৃ. ১০৬।

৪ বৈদিক সাহিত্য -ব্রাহ্মণ, আরণ্যক ও উপনিষদ নিয়ে গঠিত। এগুলির রচনাকাল আনুমানিক ১৪০০-১০০০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দ।

৫ অজয় রায়, আদি বাঙালি নৃতাত্ত্বিক ও সমাজতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ, বাংলা একাডেমি, ১৯৯৭, পৃ. ১৫।

এখানে উল্লেখযোগ্য আর্যরা পূর্বভারতে তাদের আধিপত্য সম্প্রসারণকালে প্রতিনিয়ত স্থানীয়দের প্রতিরোধের সম্মুখীন হয়। প্রতিরোধ সৃষ্টিকারী এই স্থানীয় অনার্যদের ঋগ্বেদে 'দাস', দস্যু, পশু, পাখি, ইতর, ভয়ঙ্কর ও ঘৃণিত প্রাণী হিসেবে আখ্যা দেয়া হয়েছে। রাক্ষস, খোক্কস, নাগ, দস্যু, পক্ষী ইত্যাদি হরেক রকম শত্রুপক্ষের নাম বৈদিক সাহিত্যে প্রচুর।

সম্ভবত পূর্বভারতে অর্থাৎ বাংলা অভিমুখে আর্যরা সবচেয়ে প্রবল প্রতিরোধের সম্মুখীন হয়েছিল। কারণ আর্যসাহিত্যের সর্বত্র বঙ্গজনদের সম্পর্কে চরম ঘৃণা ও শত্রুতামূলক শব্দ ও বাক্য ব্যবহৃত হয়েছে। বঙ্গজনপদকে তারা অসুর জাতি ও দস্যুদের দেশ হিসেবে অভিহিত করে। বৈদিক সাহিত্যে বাংলা অঞ্চলকে ম্লেচ্ছ ও অস্পৃশ্যদের দেশ উল্লেখ করে আর্যদের সে দেশে গমনাগমনের ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করেছিল। সে দেশে কেউ গেলে সে অপবিত্র হয়ে যাবে।[৬] এ থেকে প্রতীয়মান হয় বঙ্গজনপদ সম্পর্কে আর্যদের মনে যুগপৎ ভীতি এবং ঘৃণা সমভাবে কার্যকর ছিল। এ ধরনের অবস্থা বর্তমান বিশ্বেও বিরল নয়। যেমন পৃথিবীর অনেক দেশে বৈরী পরিবেশে মার্কিন নাগরিকদের ভ্রমণের ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি আছে। বাংলাদেশের নাগরিকদেরও পাসপোর্টে সিল দিয়ে ইসরায়েলসহ পৃথিবীর অনেক দেশে ভ্রমণের ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে।

বৌধায়ন ধর্মসূত্রে উল্লেখ আছে আর্যগণ অল্প সময়ের জন্য পুণ্ড্র ও বঙ্গদেশে বাস করলেও তাদের প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে।[৭] এ কথা মনে করার পর্যাপ্ত কারণ আছে যে, আর্য আধিপত্যের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ যুদ্ধে পরাজিত স্থানীয় নর-নারীরা আর্যদের হাতে 'দাস' এবং 'দস্যু'তে পরিণত হয়েছিল। কারণ আর্যরা প্রথম থেকেই এ দেশের মানুষের সাথে রাজনৈতিক লড়াইয়ে নিষ্ঠুর ব্যবহার করেছে। এর অসংখ্য প্রমাণ রয়েছে ঋগ্বেদে, যেখানে দেখা যায়, আর্যরা সঙ্কটকালে ব্যাপকভাবে নির্মম গণহত্যা চালানোয় সিদ্ধহস্ত। ভারতের ইতিহাসের একজন বিশিষ্ট গবেষক লিখেছেন: আর্যগোষ্ঠীপতি 'দস্যু'দের প্রতি ছিলেন অতিশয় নির্দয়। ঋগ্বেদে 'দস্যুহত্যা' কথাটির উল্লেখ আছে অসংখ্যবার। প্রকৃত পক্ষে 'দাস' এবং 'দস্যু' হলো পরাজিত সেই অনার্য জনগোষ্ঠী, আর্যদের হাতে যারা নির্মম নির্যাতনের শিকার হয়েছিল। একজন আর্যগোষ্ঠীপতি অনার্য বিদ্বেষী হয়ে এমন গণহত্যা ঘটিয়েছিলেন যে বৈদিক সাহিত্যেই তাকে 'ত্রাসদস্যু' খেতাব দেয়া হয়।

বৌধায়ন ধর্মসূত্রে বঙ্গদেশে যাওয়ার অপরাধে প্রায়শ্চিত্তের বিধান ঘোষণা করা হলেও মহাভারতে (রচনাকাল ১৪০০-১০০০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দ) কিন্তু বঙ্গদেশের নদ-নদীকে পবিত্র তীর্থস্থান বলে গণ্য করা হয়েছে। এ থেকে মনে হয় এ যুগে বঙ্গদেশ সম্পর্কে আর্যদের মনে প্রবল আগ্রহ সৃষ্টি হয়েছিল। সম্ভবত বাংলার উর্বর জমির সন্ধান পাওয়ার ফলেই তাদের চিন্তা ও মানসে এ পরিবর্তন ঘটে। বগুড়া জেলার মহাস্থানে প্রাচীন পুণ্ড্র নগরের ধ্বংসাবশেষের মধ্যে প্রাকৃত ভাষায় খ্রিষ্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দীর ব্রাহ্মী শিলালিপি, নোয়াখালি জেলায় শিলুয়াতে প্রাপ্ত মূর্তির গায়ে উৎকীর্ণ খ্রিষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতকের ব্রাহ্মী অক্ষরে লিখিত লিপি- পাওয়ার ফলে এ অনুমানের ভিত্তি আরো মজবুত হয়ে ওঠে।

অর্থাৎ খ্রিষ্টজন্মের আনুমানিক ২০০০ বছর আগে আর্যরা ভারতবর্ষে প্রবেশ করলেও

---

৬ ড. মোহাম্মদ হাননান, বাঙালির ইতিহাস, অনুপম প্রকাশনী, ১৯৯৮, পৃ. ২৩।

৭ রামশরণ শর্মা, প্রাচীন ভারত, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, কলিকাতা, ১৯৮৯ পৃ. ৫৮; হাননান, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪।

বঙ্গজনপদ তাদের অধিকারে আসে মাত্র খ্রিষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতকের দিকে। খ্রিষ্টপূর্ব ২০০০ থেকে ২০০ পর্যন্ত কমবেশি এই দুই সহস্রাব্দ কালই হচ্ছে দেশীয় সভ্যতার মূলধারার সাথে আর্যসংস্কৃতির আধিপত্য বিস্তারের মরণপণ সংগ্রামের চিহ্নিত কালপর্ব। এতদসত্ত্বেও এ সময়েও বঙ্গজনপদে পুরোপুরি আর্যসভ্যতা প্রতিষ্ঠিত হয়নি। কোন কোন অংশে আর্যসভ্যতার বিরুদ্ধে তখনো প্রতিরোধ চলছে। আর এ দেশ পুরোপুরি আর্য অধিকারে আসে আনুমানিক চতুর্থ খ্রিষ্টাব্দে, গুপ্তযুগের পূর্বে।

লক্ষণীয়, ঋগ্বেদের যুগে আর্যরা বঙ্গদেশ সম্পর্কে সামান্যই জানত। কিন্তু মহাভারতের যুগে বঙ্গজনপদবাসীরা ছিল আর্যদের ঘোরতর শত্রু। আর মনুসংহিতার যুগে গঙ্গা, করতোয়ার জল আর্যদের তীর্থস্থান হয়ে ওঠে।

পুরাণ ও মহাভারতে বর্ণিত আছে দীর্ঘতমা নামে এক অন্ধ আর্য ঋষি যজাতির বংশধর বলি রাজার গৃহে আশ্রয় লাভ করেন। রাজার অনুরোধে রানি সুদেষ্ণার গর্ভে তিনি পাঁচটি পুত্র উৎপাদন করেন। এদের নাম অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, পুণ্ড্র ও সুহ্ম।

এ আর্যদের রচিত এক শঠতাপূর্ণ কাহিনী। এতে সন্দেহ নেই। তবে আর্যদের আগমনের পূর্বেই যে আর্যঋষিরা এ দেশে এসেছিল এবং পরবর্তী যুগে আর্যসভ্যতা বিকাশের ক্ষেত্র প্রস্তুতির কাজে ব্যাপৃত ছিল তা স্পষ্ট বুঝা যায়। এ থেকে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্যের ইঙ্গিত পাওয়া যায়। মহাভারতের যুগের - বহুপূর্ব হতেই সম্ভবত এ পাঁচটি রাষ্ট্রের অস্তিত্ব ছিল এবং চতুর আর্যঋষি সে সম্পর্কে ওয়াকিবহাল ছিলেন। এমন সম্ভাবনাও দেখা দেয় শুধুমাত্র ভৌগোলিক নয়, সাংস্কৃতিক ও নৃতাত্ত্বিক দিক থেকেও এসব রাষ্ট্র পরস্পরের অত্যন্ত কাছাকাছি ছিল। এমনকি প্রতিরক্ষাগত দিক থেকে এদের পক্ষে সম্মিলিত কোন রাষ্ট্রসংঘের পরস্পর ঘনিষ্ট সদস্য হওয়াও বিচিত্র নয়। কারণ সেই প্রাচীন যুগেই এসব জনপদে রাষ্ট্রসংঘ গড়ে উঠার সংবাদ পাওয়া যায় এ সব প্রাচীন গ্রন্থের পৃষ্ঠায়।

মহাভারতে বর্ণিত আছে শ্রীকৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরকে বলছেন বঙ্গ, পুণ্ড্র ও কিরাত দেশের অধিপতি পৌণ্ড্রক বাসুদেব বলসমন্বিত, বিপুল পরাক্রমশালী ও প্রবল সামরিক শক্তির অধিকারী। তিনি লোকবিশ্রুত, অত্যন্ত প্রসিদ্ধ ও সমৃদ্ধ সম্রাট জরাসন্ধের অনুগত। অর্থাৎ মগধরাজ জরাসন্ধের সাথে পুণ্ড্র, বঙ্গ ও কিরাত নিয়ে গঠিত রাষ্ট্রজোট বা সংঘরাষ্ট্রের রাজারা বন্ধুত্বপূর্ণ ও মিত্রতার সম্পর্কে আবদ্ধ। তারা জরাসন্ধের পরামর্শ বা আদেশ মেনে চলতেন। এ সময় বঙ্গের রাজা ছিলেন সমুদ্রসেন। তার পুত্রচন্দ্র সেনও বঙ্গের রাজা হয়েছিলেন। এমনকি মগধ, পুণ্ড্র এবং কামরূপের মধ্যে বৃহত্তর মিত্রজোটও গড়ে উঠেছিল পরবর্তীতে। মহাভারতেই বর্ণিত হয়েছে, সম্রাট জরাসন্ধের মৃত্যুর পর রাজা কর্ণ কলিঙ্গ, অঙ্গ, সুহ্ম, পুণ্ড্র ও বঙ্গদেশ নিয়ে এক যুক্তরাষ্ট্র গঠন করেছিলেন। মহাভারতে অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, পুণ্ড্র ও সুহ্ম এই পাঁচ জনপদ সম্পর্কে উল্লিখিত জনকাহিনী থেকে প্রতীয়মান হয় এই পাঁচটি জনগোষ্ঠী নৃতাত্ত্বিক দৃষ্টিতে অভিন্ন। সম্ভবত এরা একই নৃগোষ্ঠীর পাঁচটি স্বতন্ত্র কোম বা গোত্র।[৮]

মহাভারতে (খ্রিষ্টপূর্ব ১০০০-৪০০ অব্দ) দ্রৌপদীর স্বয়ংবর সভায় বঙ্গরাজ সমুদ্রসেনের পুত্র 'প্রতাপবান' চন্দ্রসেন, পৌণ্ড্ররাজ বাসুদেব এবং তাম্রলিপ্তির রাজার নাম উল্লেখ আছে। বর্ণিত আছে শ্রীকৃষ্ণ তদানীন্তন রাজনৈতিক অবস্থার বিবরণ দিতে বঙ্গ, পুণ্ড্র ও কিরাত দেশের

---

৮ নীহার রঞ্জন রায়, বাঙালীর ইতিহাস (আদিপর্ব), দে'জ পাবলিশিং, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৯৯৩, পৃ. ১২৩।

শক্তিমত্তার কথা উল্লেখ করেন। কর্ণ কর্তৃক কলিঙ্গ, অঙ্গ, সুহ্ম, পুণ্ড্র ও বঙ্গদেশ-কে একত্রিত করে এক যুক্তরাষ্ট্রের অধীনে আনার সংবাদও আছে এখানে। মহাভারতে আরো উল্লেখ আছে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে বঙ্গরাজ কৌরব দুর্যোধনের পক্ষ অবলম্বন করেন এবং যুদ্ধক্ষেত্রে অতুল সাহস ও পরাক্রমের পরিচয় দেন।[৯]

আরণ্যকের রচয়িতা পূর্ব জনপদবাসীদের 'বায়াংসি' অর্থাৎ পাখি বলে উল্লেখ করেছেন। এ থেকে বুঝা যায় আর্যদের নিকট এদেশীয় ভাষা দুর্বোধ্য ছিল। কারণ বৈদিক ঋষিগণ অন্য জনগোষ্ঠীর ভাষা বুঝতে না পারায় তাদেরকে পশু, পাখি বা ইতর প্রাণীর সাথে তুলনা করতেন, তাদেরকে মনুষ্য পদবাচ্য মনে করতেন না।[১০]

বিশেষ করে আর্যদের বিরুদ্ধে যুদ্ধরত জনগোষ্ঠীকে তারা আরো বিকৃত ও ঘৃণিত রূপে চিত্রিত করার প্রয়াস পেয়েছেন। ঋগ্বেদে যুদ্ধরত শত্রুদের 'দেবহীন ও অন্যব্রতচারী' হিসেবেও উল্লেখ করা হয়েছে। পক্ষান্তরে লক্ষণীয় রামায়ণে প্রাচ্যদেশীয় রাজন্যবর্গ অত্যন্ত সম্মান ও শ্রদ্ধার আসনে সমাসীন। রামচন্দ্রের 'অশ্বমেধ যজ্ঞে' রাজপুরোহিত বশিষ্ট অঙ্গ, মগধ ও অন্য প্রাচ্যরাজাদের আমন্ত্রণ জানানোর জন্য রাজাকে উপদেশ দিয়েছেন।

কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে পুণ্ড্ররাজ বাসুদেব, মগধরাজ জরাসন্ধ ও কামরূপরাজ ভগবত দত্ত প্রাচ্য ভারতের বিখ্যাত ও প্রভাবশালী নৃপতি ছিলেন। তারা মিত্রজোট গঠন করেছিলেন। হস্তিনাপুরে যুধিষ্ঠিরের রাজ্যাভিষেক কালে বঙ্গরাজ সমুদ্রসেন ও পুণ্ড্ররাজ আমন্ত্রিত হয়ে উপস্থিত ছিলেন। তারা উভয়েই ছিলেন সে যুগের বরেণ্য নৃপতি।[১১]

মহাভারতে প্রাচ্য ভারতের প্রতিভূ প্রবল প্রতাপ পৌণ্ড্ররাজ বাসুদেবকে উত্তর ভারত তথা আর্যাবর্তের পৌরাণিক ব্রাহ্মণ্যধর্মের রক্ষক শ্রীকৃষ্ণের প্রবলতম প্রতিপক্ষ বলে উল্লেখ করা হয়েছে। প্রাচ্যের ত্রয়ী মিত্রশক্তি মগধরাজ জরাসন্ধ, পৌণ্ড্ররাজ বাসুদেব ও কামরূপ রাজ ভগবতদত্তের মিত্রতায় শঙ্কিত শ্রীকৃষ্ণকে যুধিষ্ঠিরের নিকট শঙ্কা প্রকাশ করতে দেখা যায়: 'এদের বর্তমানে যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞ সম্পাদনের মনস্কামনা পূরণ অসম্ভব।' মনে রাখতে হবে মথুরার যাদব কৃষ্ণ ও পৌণ্ড্রক বাসুদেবের মধ্যকার দ্বন্দ্ব কেবল পার্থিব শক্তি অর্থাৎ রাজ্য জয়ের সঙ্ঘাত নয়, দু'টি প্রতিদ্বন্দ্বী সংস্কৃতির মধ্যে সংঘর্ষেরও প্রতীক। এরই অনুবৃত্তিক্রমে আমরা দেখতে পাই, মিত্রতা ও সমর শক্তিতে বলীয়ান বাসুদেব যুদ্ধে মথুরাপতি শ্রীকৃষ্ণকে আরব সাগরে দ্বারকাদ্বীপে তাড়িয়ে দেন। নিজ অঙ্গে 'গদা-পদ্ম-শঙ্খ-চক্র' চিহ্ন ধারণ করে তিনি নিজেকে বিষ্ণু অবতার ঘোষণা করে আর্যাবতের ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক আধিপত্যের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন।

টলেমি-র ভূগোল গ্রন্থ এবং আনুমানিক ৪০ খ্রিষ্টাব্দে রচিত প্রাচীন গ্রিক গ্রন্থ 'পেরিপ্লাস অব দি ইরিথ্রিয়ান'-এ কিরাত দেশের উল্লেখ আছে এবং সম্ভবত নেপাল, ভূটান, সিকিম, দুয়ার এবং কুচবিহার পর্যন্ত এর সীমানা বিস্তারিত ছিল। এ জনপদের অন্তর্ভুক্ত ছিল আধুনিক দিনাজপুর জেলার কিছু অংশ। এ অঞ্চলে প্রাপ্ত গুপ্ত আমলের (৪৪৮-৪৫০ খ্রি.) ও প্রথম মহীপালের রাজত্বকালের 'তাম্রশাসন পট্টে' পঞ্চনগর নামক বিষয় ও শাসন কেন্দ্রের নাম

---

৯ R.C. Majumdar, History of Bangladesh, 1st Vol. Old age, General printers & publishers ltd, Calcutta, Eighth Edition, 1988, P. 23

১০ নীহার রঞ্জন রায়, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৩।

১১ প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৪।

বারবার উল্লিখিত হয়েছে। তাম্রশাসনে উল্লিখিত এই পঞ্চনগরই সম্ভবত: টলেমি কথিত 'পেন্টাপোলিস' এবং দিনাজপুরের 'বেলওয়া - হরিনাথপুর - চরকাই - দেবীপুর - ফুলবাড়ি' অঞ্চলই হয়ত প্রাচীন 'পঞ্চনগর' বা 'পেন্টাপোলিস'।[১২]

যুদ্ধ বিদ্যায়, বিশেষ করে গজযুদ্ধে প্রাচ্য জনপদবাসী অত্যন্ত পারদর্শী ছিলেন। মহাভারতে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের বর্ণনায় দেখা যায়:

> 'গজযুদ্ধ বিশারদ অঙ্গ-বঙ্গ, পুণ্ড্র, তাম্রলিপ্তক বীরগণ একত্রে মিলিত জলধারাবর্ষী জলদের ন্যায় শর, তোমর ও নাচার বর্ষণপূর্বক পাঞ্চাল সৈন্যকে নিপীড়িত করিতে লাগিলেন। ... বঙ্গদেশীয় মহামাত্রগণ ক্রুদ্ধ হইয়া নকুলকে সংহার করিবার মানসে সুবর্ণময় রজ্জু ও তনুচ্ছেদ সংবলিত পতাকাযুক্ত পর্বতাকার গজযূথ লইয়া তাহার অভিমুখীন হইলেন।'

উলে-খ্য কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে বঙ্গরাজ সমুদ্রসেন ও পুণ্ড্ররাজ বাসুদেব উভয়েই কৌরবদের পক্ষে যুদ্ধ করেছিলেন এবং অসীম সাহসিকতার সাথে যুদ্ধ করে প্রাণ বিসর্জন দিয়েছিলেন।[১৩]

এ আলোচনা থেকে স্পষ্ট হয়ে ওঠে প্রাচ্য জনপদসমূহে অতি প্রাচীনকালেই এমনকি মহাভারতের যুগের পূর্ব থেকেই রাষ্ট্র ব্যবস্থার বিকাশ ঘটেছিল। অর্থাৎ এ অঞ্চলে আর্যদের ভারতবর্ষে আগমনেরও পূর্বে খ্রিষ্টপূর্ব ২৫০০ সালের সমসাময়িক কালে অথবা পশ্চিম ও উত্তর ভারতের হরপ্পা সভ্যতারও পূর্বে শক্তিশালী একটি সভ্যতার বিকাশ ঘটেছিল। সমৃদ্ধ নগর, শাসনকেন্দ্র, তাম্রশাসন লিপি ইত্যাদির মাধ্যমে সংগঠিত আমলাতন্ত্রেরও আভাস পাওয়া যায় এ সভ্যতার আকর থেকে।

'দীপবংশ' ও 'মহাবংশ' নামক প্রাচীন দু'খানি সিংহলী ইতিহাস গ্রন্থে গৌতমবুদ্ধের জন্মেরও বহুপূর্বে জনৈক বঙ্গরাজ সিংহবাহু ও তার পুত্র বিজয় সিংহের কথা উল্লেখ আছে। বিজয় সিংহ সমুদ্রপথে লঙ্কাদ্বীপে উপনীত হয়ে সেখানে স্বতন্ত্র রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন।[১৪] এ থেকে বুঝা যায় তদানীন্তন বঙ্গবাসী নৌবিদ্যায় ও সমুদ্র যাত্রায় কুশলতা অর্জন করেছিলেন। মেদিনীপুর জেলার পান্না গ্রামে একটি পুকুর খোড়ার সময় ৪৫ ফুট গভীর থেকে পাওয়া গেছে সমুদ্রগামী এক নৌকার কঙ্কালবিশেষ।[১৫] তাছাড়া চন্দ্রকেতুগড় সিলমোহরে সমুদ্রগামী জলযানের প্রতিকৃতি গঙ্গারিডিদের রণপোত ও নৌবাণিজ্যের পরিচয় দেয়।[১৬] অর্থাৎ রাষ্ট্র ব্যবস্থা গড়ে ওঠার ফলে সংগঠিত আমলাতন্ত্র এবং স্থল ও নৌযুদ্ধে পারদর্শী সামরিক শক্তিও সংগঠিত হয়েছিল প্রাচীন এ সভ্যতা বিকাশের কালপর্বেই।

বহির্ভারতীয় উৎস থেকেও পূর্বভারত ও বঙ্গদেশীয় জনপদে প্রাচীন রাষ্ট্রকাঠামো ও বিকশিত সভ্যতার অস্তিত্বের প্রমাণ মেলে। বিশেষ করে গ্রিক ঐতিহাসিকগণ আলেক্সান্ডারের ভারতবর্ষ আক্রমণের যে ইতিহাস লিপিবদ্ধ করে গেছেন তা থেকে গঙ্গা নদীর নিম্ন-অববাহিকায় শক্তিশালী রাষ্ট্র ব্যবস্থা গড়ে ওঠার প্রমাণ মেলে। গঙ্গা অববাহিকায় পূর্ব প্রান্তিকে দু'টি

---

১২ প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৫।

১৩ প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৬।

১৪ প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৬।

১৫ অতুল সুর, পৃ. ৭১।

১৬ ঐ, পৃ. ৭৭।

শক্তিশালী রাষ্ট্রের কথা মহাবীর আলেক্সান্ডার (খ্রি.পূ. ৩২৬) জানতেন। ঐ দু'টি রাষ্ট্রের একটি ছিল 'গঙ্গারিডি' বা গঙ্গারিঢ়ি (যার অর্থ গঙ্গা হৃদয়) আর অপরটি 'প্রাসিঐ' বা প্রাসী।

প্রত্নতাত্ত্বিক ও ঐতিহাসিক বিবেচনা

প্রত্ন বিশেষজ্ঞ উইলফোর্ড মনে করেন বাঙলাদেশের অধিকাংশ এলাকাই অতীতে সংস্কৃত ভাষায় 'গঞ্চর দেশ' নামে পরিচিত ছিল। এ থেকেই গ্রিক ঐতিহাসিকেরা দেশটিকে 'গঙ্গারিডি' নামে অভিহিত করেন। ভার্জিল প্রণীত ভূগোল গ্রন্থেও 'গঙ্গারিডি'র নাম উল্লেখ আছে।[১৭] গঙ্গাতীরবর্তী অঞ্চলে দীর্ঘকাল অবস্থানের পর গ্রিক কূটনীতিবিদ মেগাস্থিনিস তার বিখ্যাত 'ইন্ডিকা' নামক গ্রন্থটি প্রণয়ন করেন। কালের প্রবাহে সে গ্রন্থ আজ বিলুপ্ত হয়েছে। কিন্তু মেগাস্থিনিসের সেই প্রাচীন গ্রন্থের সূত্র উল্লেখ করে গঙ্গারিডি সম্পর্কে প্লিনি ও সেলিনাস যে বিষদ বর্ণনা দিয়েছেন, কালের বাধা অতিক্রম করে তা আজো টিকে আছে। সে বর্ণনা অনুসারে গঙ্গারিডির রাজার ছিল যুদ্ধে যাওয়ার জন্য সদাপ্রস্তুত এক বিশাল সেনা বাহিনী যার অন্তর্ভুক্ত ছিল ৬০০০০ পদাতিক, ১০০০ অশ্বারোহী আর ৭০০ রণহস্তী।

অপর বর্ণনায় বলা হয়েছে গঙ্গানদীর শেষভাগ এই রাজ্যের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত। গঙ্গা নদীর যে দু'টি স্রোত এখন ভাগিরথী ও পদ্মা নামে প্রবাহিত হচ্ছে এর মধ্যস্থলে গঙ্গারিডি জাতির বাস ছিল। গ্রিক বিবরণ থেকে আরো জানা যায়: 'ভারতবর্ষে বহুজাতির বাস। তন্মধ্যে গঙ্গারিডই জাতিই সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বাপেক্ষা প্রভাবশালী। ইহাদের চারিসহস্র বৃহদাকার সুসজ্জিত রণহস্তী আছে, এই জন্যই অপর কোন রাজা এই দেশ জয় করিতে পারেন নাই। স্বয়ং আলেকজান্ডারও এই সমুদয় হস্তীর বিবরণ শুনিয়া এই জাতিকে পরাস্ত করিবার দুরাশা ত্যাগ করেন।[১৮]

অজয় রায় তাঁর গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন পুরাকালে সুহ্ম (বা রাঢ়), বঙ্গ ও পৌণ্ড্র নামে প্রাচীন বঙ্গে যে তিনটি রাষ্ট্র গড়ে উঠেছিল তাই পরবর্তীকালে সম্মিলিতভাবে গ্রিক ঐতিহাসিকদের কাছে 'গঙ্গারিডি' বা 'গঙ্গারিঢ়ি' নামে পরিচিতি লাভ করে। জনৈক গ্রিক নাবিক লিখেছেন (সম্ভবত প্রথম বা দ্বিতীয় শতাব্দে) বাঙলার সুক্ষ্ম মসলিন কাপড় এখান থেকে সুদূর পশ্চিম দেশে রপ্তানি হইত।[১৯]

গ্রিক ঐতিহাসিকদের কথিত 'প্রাসী' হল প্রাচীন কালের মহাশক্তিশালী মগধ রাজ্য। যার রাজধানী ছিল প্রথমত: 'গিরিব্রজ' বা 'রাজগিরি' বা 'রাজগৃহ' এবং পরবর্তীতে বৈশালীতে এবং তারও পরে পাটলিপুত্রে। গ্রিকগণ যাকে 'পলিবোথ্রা' হিসেবে উল্লেখ করেছেন। গৌতমবুদ্ধের জন্মেরও বহুপূর্ব থেকেই এ রাজ্যের শক্তিশালী উপস্থিতির কথা শ্রুতি সাহিত্য, বেদ, পুরাণ ও মহাকাব্যের উপাখ্যান থেকে জানা যায়।

স্মরণ করা যেতে পারে মহাভারতের ভীষ্ম কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে পূর্ববঙ্গের রাজার পরাক্রম এবং গজযুদ্ধের কুশলতা ও পরবর্তীতে গ্রিকগণ শক্তিশালী গঙ্গারিডই জাতির উপস্থিতির কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। এ ক্ষেত্রে মহাভারতের বর্ণনা এবং গ্রিক ঐতিহাসিকদের বিবরণ যেন পরিপূরক বলে মনে হয়।[২০]

---

[১৭] অজয় রায়, আদি বাঙালির নৃতাত্ত্বিক ও সমাজতাত্ত্বিক বিশে-ষণ, বাংলা একাডেমি, ১৯৯৭, পৃ. ১২৭।

[১৮] R C. Majumdar, ibid, P. 24

[১৯] ঐ, পৃ. ২৭।

মহাবীর আলেকজাণ্ডার ভারত বর্ষের বিপাশা নদীর পশ্চিম পাড় পর্যন্ত অগ্রসর হয়ে প্রাসী ও গঙ্গারিডি রাষ্ট্রের প্রভূত ক্ষমতা এবং বিপুল সমর শক্তির কথা অবগত হন। কুইন্টাস কারিটিয়াস বর্ণনা করেছেন- ২০,০০০ অশ্বারোহী, ২,০০০ যুদ্ধরথ, ৪,০০০ রণহস্তী ও ২০,০০০ পদাতিকসহ এই দু'টি রাজ্যের সম্মিলিত বিশাল সৈন্যবাহিনী আলেকজাণ্ডারকে প্রতিহত করার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করে।[২১] অপর গ্রিক ঐতিহাসিক প্লুতার্ক গঙ্গারিডি-র প্রতিরোধ সম্পর্কে লিখেছেন, তারা ৮০,০০০ অশ্বারোহী, ২,০০,০০০ পদাতিক, ৮,০০০ রথ এবং ৬,০০০ যুদ্ধহস্তী নিয়ে আলেকজাণ্ডারের জন্য অপেক্ষা করছিল।[২২]

একথা শুনে আলেকজান্ডার আর বিপাশা নদী অতিক্রম করেননি। কারণ বিপাশা পার হলেই মগধের রাজা এগ্রাম্মেসের (উগ্রসেন) রাজ্য। সেখানে মগধ ও গঙ্গারিডি রাজ্যের সম্মিলিত বাহিনীর সম্মুখীন হতে হবে। এগ্রাম্মেস- এর পরাক্রম সম্পর্কে ম্যাসিডোনীয় সৈন্যদের মনে এক দারুণ আতঙ্ক বিরাজ করছিল। আলেকজান্ডার বিপাশা অতিক্রম করে আরো পূর্বে অগ্রসর হওয়ার সঙ্কল্প ব্যক্ত করলেও ম্যাসিডোনীয় সৈন্যরা আর এক কদমও অগ্রসর হতে রাজি হয় নি। ফলে সেখান থেকেই মহাবীর আলেকজাণ্ডারের পশ্চাদপসরণ শুরু।[২৩] প্রাসী ও গঙ্গারিডি রাজ্যদ্বয় স্বতন্ত্র হলেও উভয় রাজ্যের রাজা ছিলেন একজন। কারিটিয়াসের উচ্চারণে তার নাম 'এগ্রাম্মেস' (Agrammes), দিয়োদোরাসের মতে এই নাম 'কন্দ্রমেস'। আবার জাস্টিনের বর্ণনায় ... 'নন্দ্রুস'। অথবা 'জ্যান্ড্রামেস' (Xandrames)। উল্লেখ্য, আলেকজান্ডারের ভারত আক্রমণকালে সম্ভবত মহাপদ্মের পুত্র উগ্রসেন মগধের রাজা ছিলেন।[২৪]

যাহোক, এ সময়ে গঙ্গারিডি এবং প্রাসী বা মগধ এ রাজ্য দু'টি মৈত্রীবন্ধনে আবদ্ধ হয়ে একটি সংযুক্ত রাষ্ট্র ব্যবস্থা গড়ে তুলেছিল।[২৫] মহাভারতের কাহিনীতেও পুণ্ড্র, মগধ এবং কামরূপ রাজ্যের ত্রয়ী মৈত্রীজোটের কথা উল্লেখ আছে। ইত:পূর্বে তা উল্লিখিত হয়েছে।

গণ ও সংঘ রাজ্যের অস্তিত্ব ও আমলাতন্ত্রের উন্মেষ

উল্লেখ্য এ সময় ভারতবর্ষের বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে গণ ও সংঘ রাজ্যের অস্তিত্ব ছিল। দীলিপ গঙ্গোপাধ্যায় কথিত ৯টি রাজ্য নিয়ে গঠিত বৃজি রাষ্ট্রসংঘের রাজ্যগুলি মোটামুটিভাবে নেপালের দক্ষিণ পশ্চিমে, গঙ্গার উত্তরে এবং মল্লর রাজ্যের পশ্চিমে অবস্থিত ছিল। রাজ্যগুলির মধ্যে বিদেহ, লিচ্ছবি, জ্ঞাতৃক ও লিচ্ছবিই ছিল প্রধান। এছাড়াও উগ্র, ভর্গ, ইক্ষাকু ও কুরুরাজ্যও ছিল বৃজি রাষ্ট্রসংঘের সদস্য। বৃজি রাষ্ট্রসংঘের রাজধানী বৈশালী, বৈশালী আবার লিচ্ছবি রাজ্যেরও রাজধানী ছিল। মহামতি গৌতমবুদ্ধ লিচ্ছবিদের ঐক্য, তেজস্বিতা, মহানুভবতা ও গণতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গীর ভূয়সী প্রশংসা করেন। প্রিয় শিষ্য আনন্দকে তিনি বলেন, যতদিন পর্যন্ত লিচ্ছবি তথা বৃজিরা ঐক্যবদ্ধ থাকবে, ততদিন পর্যন্ত তারা

---

২০ R.C. Majumdar, ibid, P. 24

২১ অজয় রায়, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৮।

২২ সুনীল চট্টোপাধ্যায়, প্রাচীন ভারতের ইতিহাস, দ্বিতীয় খণ্ড, (কলিকাতা) ১৯৯৫, পৃ. ২৭১; ড. হাননান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৪।

২৩ দীলিপ কুমার গঙ্গোপাধ্যায়, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১৪; ড. হাননান, পৃ. ৫৪।

২৪ ঐ, পৃ. ১৯৭।

২৫ অজয় রায়, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৮।

নিরাপদ। তাঁর এ কথা অক্ষরে অক্ষরে ফলে যায়। মগধ রাজ অজাতশত্রুর সাথে যুদ্ধে যতদিন তারা এক ছিলেন, ততদিন অজাত শত্রু তাদের পরাজিত করতে পারেনি। এক দশকেরও বেশি সময় ধরে চলা এ যুদ্ধে যখনই তাদের ঐক্যে ফাটল ধরে, তখন আত্মসমর্পন ছাড়া আর তাদের কোনো গত্যন্তর ছিল না।[২৬]

বিভিন্ন প্রত্নতাত্ত্বিক সাদৃশ্য, সামাজিক রীতি ও লোকসাহিত্যের উপাদান বিশ্লেষণ করে অনেক পণ্ডিত মন্তব্য করেন যে প্রাচীন বঙ্গীয় সভ্যতার নির্মাতা ও বাহকদের সাথে ভারতবর্ষের অন্যান্য অঞ্চলের এবং সমুদ্রপথে বহির্বিশ্বের সাথে যোগাযোগ ছিল। পশ্চিমবঙ্গে তাম্রাশ্মযুগীয় সভ্যতার নিদর্শন এবং অতি সম্প্রতি নরসিংদি জেলার 'ওয়ারি বটেশ্বরে' (সৌনাগড়া?) প্রত্নতাত্ত্বিক খননে প্রাচীন সভ্যতার প্রাপ্ত নিদর্শনসমূহ এ ধারণাকে দৃঢ়তর ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করে।

প্রাচীন বঙ্গে উন্নত সভ্যতা ও রাষ্ট্রকাঠামো বিকাশের এই প্রবণতা আমাদের আলোচনায় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচিত হতে পারে। কারণ যেখানে রাষ্ট্র কাঠামো বিকশিত হতে পারে, প্রবল পরাক্রান্ত স্থল ও নৌবাহিনী গড়ে উঠতে পারে, সমুদ্র অভিযান সংঘটিত হতে পারে, ভারত মহাসাগর ও সুদূর কৃষ্ণ সাগরে রাজত্ব ও উপনিবেশ প্রতিষ্ঠিত হতে পারে, বহির্দেশীয় বাণিজ্য সংঘটিত হতে পারে, দেশীয় ও আঞ্চলিক প্রতিরক্ষার জন্য মৈত্রীজোট বা সংঘরাষ্ট্রের জন্ম হতে পারে সেখানে অর্থাৎ প্রাচীন বঙ্গে রাষ্ট্রকাঠামোর আবশ্যিক অনুষঙ্গ শক্তিশালী আমলাতান্ত্রিক কাঠামোরও অনিবার্য বিকাশ ঘটেছিল এ কথা নির্দ্বিধায় বলা যায়।

বাংলার পশ্চিমাঞ্চলের বর্ধমান জেলার বোলপুরের কাছে অজয় নদীর উপত্যকায় পাণ্ডুরাজার ঢিবি খননের ফলে সভ্যতার যে নিদর্শন পাওয়া যায় সেখানে তীক্ষ্ণ খোদাই করা লিখন পদ্ধতি প্রচলন থাকার নিদর্শন চিহ্ন পাওয়া গেছে। ঐতিহাসিকেরা অনুমান করেন, খ্রিষ্টপূর্ব ২৫০০ অব্দের আগেও এ সভ্যতা বিকাশমান ছিল।[২৭]

এর অর্থ দাঁড়ায়, ভারতবর্ষে আর্যদের আগমনের পূর্বেই বাংলায় প্রাচীন ও উন্নত সভ্যতার অস্তিত্ব বিদ্যমান ছিল। ড. অতুল সুর উল্লেখ করেছেন, সেই সভ্যতার নগর পরিকল্পনা ছিল অতি উন্নতমানের, কারণ নগরে পাকা রাস্তার চিহ্ন আবিস্কৃত হয়েছে।[২৮] তামার ব্যবহার জানত সেকালে বাঙালিরা। স্থাপত্য ও প্রকৌশলগত দিক ছিল অসাধারণ এবং বিশ্বের যে কোন প্রাচীন সভ্যতার সমপর্যায়ের। আর্যসভ্যতার চেয়েও অনেক উন্নত এবং বিকাশশীল ছিল বাংলার এই অনার্য সভ্যতা।

পাণ্ডুরাজার ঢিবিতে প্রাপ্ত নিদর্শনাদি হতে ধারণা করা যায় ঐ সময় এ জনপদের অধিবাসীরা তামা এবং লোহার ব্যবহার জানত। এ ছাড়াও এখানে প্রাপ্ত অস্ত্রশস্ত্রের সাথে প্যালিওলিথিক ও মাইক্রোলিথিক যুগের অস্ত্রশস্ত্রের সাদৃশ্য বিদ্যমান। প্রাপ্ত নিদর্শন ও চিহ্নের ভিত্তিতে কোনো কোনো গবেষক অনুমান করেছেন :

> *খ্রিষ্টপূর্ব দশ হাজার বছর পূর্বেও এ ভূখণ্ডে মনুষ্য বসতি ছিল এবং প্রাচীন সভ্যতার উন্মেষ ঘটেছিল। অনেক ইতিহাসবিদ মনে করেন কোল, শবর, পুলিন্দ, হাড়ি, ডোম, চণ্ডাল,*

[২৬] দীলিপ গঙ্গোপাধ্যায়, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭২-৭৪।

[২৭] হাননান, প্রাগুক্ত, পৃ. 18-19; R.C. Majumdar, ibid, P. 24-25

[২৮] অতুল সুর, বাঙালির নৃতাত্ত্বিক পরিচয়, কলিকাতা, ১৯৭৭, পৃ. ৭৮।

তিব্বতী, বর্মী, কায়স্থ, সদগোপ, কৈবর্ত প্রভৃতি জনগোষ্ঠী এ জনপদের অধিবাসী ছিল।[২৯]

অতি সম্প্রতি অধুনা বাংলাদেশের নরসিংদি জেলার ওয়ারি বটেশ্বর এলাকায় প্রত্নতাত্ত্বিক খননের ফলে অতি প্রাচীন সভ্যতার স্মারক রেশমি গুটিকা ও প্রাচীন মুদ্রা পাওয়া গেছে। রেডিও কার্বন পরীক্ষায় জানা গেছে এগুলো খ্রিষ্টপূর্ব ৮০০ বৎসর পূর্বে বিদ্যমান সভ্যতার স্মারক। এটাই এ পর্যন্ত বর্তমান বাংলাদেশ ভূখণ্ডে প্রাপ্ত প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনগুলোর মধ্যে প্রাচীনতম।

ওয়ারি বটেশ্বরে প্রাপ্ত রেশম গুটিকার বিপুল সম্ভার ধারণা দেয় এ পণ্য বিদেশে রফতানি করার জন্য একত্রিত করা হয়েছিল। বিশেষত ষাটেরও অধিক স্থানেও এ গুটিকার সন্ধান পাওয়ার ফলে প্রাচীন বঙ্গের সাথে পৃথিবীর অন্যান্য দেশের বহির্বাণিজ্যের প্রমাণ স্পষ্ট করে তোলে। সমুদ্রগামী জাহাজও এ অঞ্চল থেকে প্রেরিত হতো এ কথা বলা যায়। অনেকে ওয়ারি বটেশ্বরকে প্রাচীন বাংলার রাজধানী সোনগৌড়া বলে অভিহিত করেছেন নদী পথের গতিবিধি পর্যালোচনা করে। অর্থাৎ এ স্থানে একটি সমৃদ্ধ নগরী এবং একটি রাষ্ট্রের অস্তিত্ব থাকার সম্ভাবনা ক্রমশ স্পষ্ট হয়ে ওঠে। অপরপক্ষে খ্রি.পূর্ব ৫৪৫ সালে বিজয় সিংহের লঙ্কা অভিযান এ অঞ্চলের সংগঠিত সামরিক শক্তির অবস্থান প্রকাশ করে।[৩০] আর বহির্বাণিজ্য, অভ্যন্তরীণ প্রতিরক্ষা, বৈদেশিক অভিযান এবং সংশ্লিষ্ট আনুষঙ্গিক ব্যাপক কার্যক্রমের নিয়ন্ত্রণের জন্য এ অঞ্চলে শক্তিশালী সরকার এবং সংগঠিত আমলাতন্ত্রের উন্মেষ ঘটেছিল এ কথা নিশ্চিত ভাবেই বলা যায়।

কিছু প্রশ্ন, কিছু পর্যালোচনা ও ত্রিভূজ তত্ত্ব

আনুমানিক খ্রিষ্টপূর্ব ২০০০ সালে যখন আর্যগণ ভারতবর্ষে প্রবেশ করে তখন তারা শুধু উত্তর ভারত নয় দক্ষিণ ভারত ও পূর্বভারতেও আধিপত্য বিস্তারের চেষ্টা চালায়। কিন্তু ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়, তাদের এ প্রচেষ্টা ৪র্থ খ্রিষ্টাব্দে গুপ্ত সম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পূর্বে পর্যন্ত সফল হয়নি। আর্যদের আগমনের বহু পূর্ব থেকেই ভারতবর্ষের পশ্চিম ও পূর্ব অংশে অত্যন্ত প্রাচীন ও প্রায় সমান্তরাল দু'টি শক্তিশালী সভ্যতার অস্তিত্ব বিদ্যমান ছিল। পশ্চিম ও উত্তর ভারতে হরপ্পা সভ্যতার পতন ঘটাতে সক্ষম হলেও পূর্ব ভারতে আর্যদের আগ্রাসন প্রচণ্ড প্রতিরোধের সম্মুখীন হয়। বিশেষত বঙ্গদেশ অভিমুখে তাদের অভিযান সবচে' বড় বাধার সম্মুখীন হয়েছিল।

পর্যালোচনায় দেখা যায়, ঋগ্বেদ থেকে শুরু করে সমগ্র বৈদিক সাহিত্যে অথবা মহাকাব্যে বঙ্গজনবাসীকে শত্রু মনে করা হয়েছে। কিন্তু কেন? এ প্রশ্নের জবাব হল, ঋগ্বেদ রচয়িতা আর্যদের সিন্ধু উপত্যকায় আগমনের বহু পূর্ব থেকেই বাঙালিরা এ জনপদে অধিবাসী হিসেবে উন্নত সভ্যতার উন্মেষ ঘটায়। এ জনপদের অধিবাসীদের সম্পর্কে তীব্র ভীতি ও আতঙ্কের বোধ থেকেই পঞ্চনদের আর্যগণ বাঙালিদের ইর্ষা ও ঘৃণার চোখে দেখত। বৈদিক সাহিত্যে এর প্রমাণ রয়েছে।

বাঙলায় বসবাসকারী প্রাকৃত ভাষাভাষীদের সংস্কৃতি ছিল ঐশ্বর্যমণ্ডিত। তারা নিজেদের সংস্কৃতিকে বৈদিক সংস্কৃতি থেকে শ্রেষ্ঠ মনে করত। পূর্ব দিকে ক্রমসম্প্রসারমান আর্যসংস্কৃতি প্রাচ্য দেশের অনার্য সংস্কৃতির কাছ থেকে প্রচণ্ড প্রতিরোধের সম্মুখীন হয়। সে জন্য ভারতে

---

[২৯] ঐ, পৃ. ২৫।

[৩০] হাননান, প্রাগুক্ত, পৃ. 18; R.C. Majumdar, ibid, P. 24-25.

তিব্বতী, বর্মী, কায়স্থ, সদগোপ, কৈবর্ত প্রভৃতি জনগোষ্ঠী এ জনপদের অধিবাসী ছিল।[২৯]

অতি সম্প্রতি অধুনা বাংলাদেশের নরসিংদি জেলার ওয়ারি বটেশ্বর এলাকায় প্রত্নতাত্ত্বিক খননের ফলে অতি প্রাচীন সভ্যতার স্মারক রেশমি গুটিকা ও প্রাচীন মুদ্রা পাওয়া গেছে। রেডিও কার্বন পরীক্ষায় জানা গেছে এগুলো খ্রিষ্টপূর্ব ৮০০ বৎসর পূর্বে বিদ্যমান সভ্যতার স্মারক। এটাই এ পর্যন্ত বর্তমান বাংলাদেশ ভূখণ্ডে প্রাপ্ত প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনগুলোর মধ্যে প্রাচীনতম।

ওয়ারি বটেশ্বরে প্রাপ্ত রেশম গুটিকার বিপুল সম্ভার ধারণা দেয় এ পণ্য বিদেশে রফতানি করার জন্য একত্রিত করা হয়েছিল। বিশেষত ষাটেরও অধিক স্থানেও এ গুটিকার সন্ধান পাওয়ার ফলে প্রাচীন বঙ্গের সাথে পৃথিবীর অন্যান্য দেশের বহির্বাণিজ্যের প্রমাণ স্পষ্ট করে তোলে। সমুদ্রগামী জাহাজও এ অঞ্চল থেকে প্রেরিত হতো এ কথা বলা যায়। অনেকে ওয়ারি বটেশ্বরকে প্রাচীন বাংলার রাজধানী সোনগৌড়া বলে অভিহিত করেছেন নদী পথের গতিবিধি পর্যালোচনা করে। অর্থাৎ এ স্থানে একটি সমৃদ্ধ নগরী এবং একটি রাষ্ট্রের অস্তিত্ব থাকার সম্ভাবনা ক্রমশ স্পষ্ট হয়ে ওঠে। অপরপক্ষে খ্রি.পূর্ব ৫৪৫ সালে বিজয় সিংহের লঙ্কা অভিযান এ অঞ্চলের সংগঠিত সামরিক শক্তির অবস্থান প্রকাশ করে।[৩০] আর বহির্বাণিজ্য, অভ্যন্তরীণ প্রতিরক্ষা, বৈদেশিক অভিযান এবং সংশ্লিষ্ট আনুষঙ্গিক ব্যাপক কার্যক্রমের নিয়ন্ত্রণের জন্য এ অঞ্চলে শক্তিশালী সরকার এবং সংগঠিত আমলাতন্ত্রের উন্মেষ ঘটেছিল এ কথা নিশ্চিত ভাবেই বলা যায়।

কিছু প্রশ্ন, কিছু পর্যালোচনা ও ত্রিভূজ তত্ত্ব

আনুমানিক খ্রিষ্টপূর্ব ২০০০ সালে যখন আর্যগণ ভারতবর্ষে প্রবেশ করে তখন তারা শুধু উত্তর ভারত নয় দক্ষিণ ভারত ও পূর্বভারতেও আধিপত্য বিস্তারের চেষ্টা চালায়। কিন্তু ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়, তাদের এ প্রচেষ্টা ৪র্থ খ্রিষ্টাব্দে গুপ্ত সম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পূর্বে পর্যন্ত সফল হয়নি। আর্যদের আগমনের বহু পূর্ব থেকেই ভারতবর্ষের পশ্চিম ও পূর্ব অংশে অত্যন্ত প্রাচীন ও প্রায় সমান্তরাল দু'টি শক্তিশালী সভ্যতার অস্তিত্ব বিদ্যমান ছিল। পশ্চিম ও উত্তর ভারতে হরপ্পা সভ্যতার পতন ঘটাতে সক্ষম হলেও পূর্ব ভারতে আর্যদের আগ্রাসন প্রচণ্ড প্রতিরোধের সম্মুখীন হয়। বিশেষত বঙ্গদেশ অভিমুখে তাদের অভিযান সবচে' বড় বাধার সম্মুখীন হয়েছিল।

পর্যালোচনায় দেখা যায়, ঋগ্‌বেদ থেকে শুরু করে সমগ্র বৈদিক সাহিত্যে অথবা মহাকাব্যে বঙ্গজনবাসীকে শত্রু মনে করা হয়েছে। কিন্তু কেন? এ প্রশ্নের জবাব হল, ঋগ্‌বেদ রচয়িতা আর্যদের সিন্ধু উপত্যকায় আগমনের বহু পূর্ব থেকেই বাঙালিরা এ জনপদে অধিবাসী হিসেবে উন্নত সভ্যতার উন্মেষ ঘটায়। এ জনপদের অধিবাসীদের সম্পর্কে তীব্র ভীতি ও আতঙ্কের বোধ থেকেই পঞ্চনদের আর্যগণ বাঙালিদের ইর্ষা ও ঘৃণার চোখে দেখত। বৈদিক সাহিত্যে এর প্রমাণ রয়েছে।

বাঙলায় বসবাসকারী প্রাকৃত ভাষাভাষীদের সংস্কৃতি ছিল ঐশ্বর্যমণ্ডিত। তারা নিজেদের সংস্কৃতিকে বৈদিক সংস্কৃতি থেকে শ্রেষ্ঠ মনে করত। পূর্ব দিকে ক্রমসম্প্রসারমান আর্যসংস্কৃতি প্রাচ্য দেশের অনার্য সংস্কৃতির কাছ থেকে প্রচণ্ড প্রতিরোধের সম্মুখীন হয়। সে জন্য ভারতে

---

[২৯] ঐ, পৃ. ২৫।

[৩০] হাননান, প্রাগুক্ত, পৃ. 18; R.C. Majumdar, ibid, P. 24-25.

প্রবেশের প্রায় দুই হাজার বৎসর পরেও বৈদিক আর্যরা বাঙলাদেশে প্রবেশ করতে পারেনি। কিন্তু পরে যখন সমর্থ হয়েছিল, তখন বৈদিক আর্যদের নতি স্বীকার করেই প্রাচ্য দেশে প্রবেশ করতে হয়েছিল। তাদের বৈদিক গরিমা তখন ক্রমশ ম্লান হয়ে গেছে।

আবার প্রত্নতাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে দেখা যাবে বাঙলা অতি প্রাচীন দেশ। প-াওসিন যুগে (পঁচিশ থেকে দশ লক্ষ বৎসর পূর্বে) এর ভূমি গঠন প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়েছিল। এ পর্যন্ত উন্নত নরাকার জীবের প্রাচীনতম কঙ্কালাস্থি পাওয়া গেছে উত্তর-পশ্চিম ভারতের শিবালিক গিরিমালায়, জাভা দ্বীপে ও চীন দেশের চুংকিং-এ।[৩১] বিশ্বমানচিত্রের এ তিনটি স্থান সরল রেখা দ্বারা যুক্ত করলে যে ত্রিভূজ পাওয়া যায় তার কেন্দ্রস্থলে বাংলাদেশের অবস্থান। সুতরাং বলা যায় এ ভূখণ্ডে আদি বাঙালির পদচারণা শুরু হয়েছিল সম্ভবত মানব সভ্যতা বিকাশের শুরু থেকেই।

১৯৭৮ সালে মেদিনীপুর জেলায় রামগড়ের অদূরে সিজুয়া নামক স্থানে পাওয়া গেছে জীবাশ্মীভূত ভগ্ন মানব-চোয়াল। রেডিও কার্বন-১৪ পরীক্ষায় এর বয়স নির্ণীত হয়েছে ১০৫০০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দে। এ থেকে নিশ্চিতভাবে প্রমাণিত হয় এখন থেকে প্রায় ১৪০০০ বৎসর পূর্বেও বঙ্গজনপদে মানব সভ্যতার অস্তিত্ব ছিল।

প্রত্নতাত্ত্বিক খননের ফলে বাংলাদেশে অন্তত খ্রিষ্টপূর্ব ১০০০০ বছর আগের প্রত্নপোলীয় যুগের বিভিন্ন হাতিয়ার পাওয়া গেছে পশ্চিমবঙ্গের বাঁকুড়া, বর্ধমান, মেদিনীপুর প্রভৃতি জেলার নানা স্থান থেকে। এগুলোর মধ্যে অন্যতম হল পাথরের তৈরি হাতিয়ার। ভারতের অন্যান্য অঞ্চলে এবং ইউরোপেও এ ধরনের হাতিয়ার পাওয়া গিয়েছিল। নবপ্রস্তর যুগ পর্যন্ত মানুষ বিভিন্ন ধরনের প্রস্তর নির্মিত হাতিয়ার ব্যবহার করত। এরপর সূচিত তাম্রাশ্ম সভ্যতার প্রতিনিধি সিন্ধু-উপত্যকার হরপ্পা ও মহেঞ্জোদারো সভ্যতা। বাংলাদেশে এরূপ সভ্যতার নিদর্শন পাণ্ডুরাজার ঢিবি (আনুমানিক খ্রিষ্টপূর্ব ২৫০০ সালের)। পাণ্ডুরাজার ঢিবি বর্ধমান জেলার আউসগ্রাম থানায় (বোলপুর শান্তি নিকেতনের নিকটে) অবস্থিত। অজয়, কুন্নুর ও কোপাই নদীর তীরে, উপত্যকার অন্যান্য স্থানেও এ সভ্যতার চিহ্ন পাওয়া গেছে। সম্প্রতি অজয় ও কুন্নুর নদীর সঙ্গমস্থলের কাছে মঙ্গলকোটে তাম্রপ্রস্তর থেকে মধ্যযুগ পর্যন্ত একটানা বিভিন্ন পর্বের সভ্যতার বিভিন্ন প্রত্নসম্ভার আবিষ্কার করেছে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়। ড. রমেশ চন্দ্র মজুমদারের মতে এ সভ্যতা বৌধায়ন ধর্মসূত্র রচনারও বহু পূর্ববর্তী। উল্লেখ্য বৌধায়ন ধর্মসূত্রেই (২/২/৩০) প্রথম 'আর্যাবর্ত' নামের উল্লেখ পাওয়া যায়।[৩২]

পাণ্ডুরাজার ঢিবিতে খননকালে বিভিন্ন স্তরে চারটি ভিন্ন যুগের সভ্যতার নিদর্শন আবিস্কৃত হয়েছে[৩৩]:

(১) প্রথম যুগের লোকেরা কাঁকরপেটা গৃহতল নির্মাণ করত, চক্রে লাল-কালো ও ধূসর রঙের মৃৎপাত্র তৈরি করত এবং ধানের চাষ করত। ভয়াবহ প্লাবনের ফলে স্থানটি পরিত্যক্ত হয়েছিল।

---

৩১ অতুল সুর, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৬।

৩২ অতুল সুর, পৃ. ৫৮।

৩৩ ঐ, পৃ. ৫৯।

(২) দ্বিতীয় যুগের লোকেরা তাম্রাশ্ম যুগের সভ্যতার। তারা সুপরিকল্পিত নগর ও রাস্তাঘাট তৈরি করত। তারা গৃহ ও দুর্গ নির্মাণ করতে জানত। তামার উন্নত ও বহুবিধ ব্যবহার তাদের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। কৃষি ও বাণিজ্য তাদের অর্থনীতির প্রধান সহায়ক। পূর্ব-পশ্চিমে শয়ন করিয়ে মৃত ব্যক্তিকে সমাধিস্থ এবং মাতৃকাদেবীর পূজো করত। রেডিও কার্বন পরীক্ষায় এ যুগের সভ্যতার কাল খ্রি.পূ. ১০১২+১২০ বলে নির্ধারিত হয়েছে।

(৩) তৃতীয় যুগে পাওয়া গেছে নবাশ্বর কুঠার, অঙ্গারমিশ্রিত লোহার অস্ত্র এবং কালো রঙের মৃৎপাত্র। পাওয়া গেছে লোহা ঢালাই করার চুল্লি। ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের জন্য তৃতীয় যুগের বসবাস পরিত্যক্ত হয়।

(৪) চতুর্থ বা ঐতিহাসিক যুগের শুরু মৌর্যযুগ থেকে।

পাণ্ডুরাজার ঢিবিতে ২য় স্তরে ক্রিট দেশে ১৫০০ খ্রি. পূর্বাব্দে নির্মিত সে দেশের প্রচলিত লিপি-পদ্ধতিতে লিখিত একটি চক্রাকার সিলমোহর পাওয়া গেছে। ক্রিট দ্বীপ ও ভূমধ্যসাগরীয় অন্যান্য দেশের সাথে তাদের বাণিজ্যের স্মারক এ সিলমোহর। বাণিজ্য পণ্যের অন্যতম ছিল মসলা, তুলা, বস্ত্র, হস্তিদন্ত, স্বর্ণ, রৌপ্য, তামা এবং হীরক। সম্ভবত গুড় এবং শর্করাও এর অন্তর্ভুক্ত ছিল। পরবর্তীকালে বাংলার গুড় ও শর্করা রোমসম্রাজ্যে বিশেষ সমাদৃত ছিল। আরো পাওয়া গেছে মাটির 'লেবেল' যা পণ্যদ্রব্যের পেটিকার সাথে বাঁধা থাকত এবং ভেতরে থাকত পণ্য ও বাণিজ্যিক লেনদেন সম্পর্কিত হিসাবপত্র।[৩৪]

মিশরীয় নাবিক টলেমির 'পেরিপ্লাস' গ্রন্থে উল্লেখ আছে বাণিজ্য উপলক্ষে ক্রিটদেশে গিয়ে বাঙালিরা সে দেশে উপনিবেশ স্থাপন করেছিল। ভেলেরিয়াস ফ্লকাস তার 'আরগনটিকা' পুস্তকে লিখেছেন, গঙ্গারিডি দেশের বাঙালি বীরেরা কৃষ্ণ সাগরের উপকূলে ১৫০০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দে (ঋগ্বেদ রচয়িতা আর্যদের ভারতে পদার্পণের প্রায় সমসাময়িক কালে) কলচিয়ান ও জেসনের অনুগামীদের বিরুদ্ধে বিশেষ বীরত্বের সাথে যুদ্ধ করেছিল। প্রখ্যাত কবি ও সাহিত্যিক ভার্জিল তার 'জর্জিকাস' কাব্যগ্রন্থে লিখেছেন, গঙ্গারিডির বাঙালি বীরদের শৌর্যবীর্যের কথা 'আমি স্বর্ণাক্ষরে লিখে রাখব।'[৩৫] সম্ভবত সে সময়ে ভূমধ্য এবং কৃষ্ণ সাগরীয় অঞ্চলের লোকেরাও তামা আহরণের জন্য বাঙলাদেশে এসে হাজির হয়েছিল।

ড. অতুল সুর তার গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন প্রায় ৩৫০০ বৎসর পূর্বে বাঙালিরা ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে সুপ্রতিষ্ঠিত ও সুপরিচিত ছিল। এ সময় দু'দেশের বণিকদের মধ্যে বৈবাহিক সম্পর্কও স্থাপিত হয়। ঐ অঞ্চলের শব্দ থেকেই বণিক, পণ্য, পনি - এসব শব্দ এ দেশীয় শব্দভাণ্ডারে যুক্ত হয়েছে। উভয় দেশের সংস্কৃতিতেও মিল আছে। উভয় দেশেই মাতৃদেবীর সাথে সিংহের সম্পর্ক আছে। উভয় দেশের রূপকথার মধ্যেও রয়েছে বিপুল সাদৃশ্য। তৎকালে ক্রিট দেশে প্রচলিত লিপি ও প্রাচীন বাংলার পাঞ্চমার্কযুক্ত মুদ্রায় উৎকীর্ণ লিপির মধ্যে আশ্চর্য রকম সাদৃশ্য। সে যুগে ক্রিট দেশের মেয়েরা দেহের উপর অংশ অনাবৃত রাখত।[৩৬] বাৎসায়ন, তার 'কামসূত্র' গ্রন্থে লিখেছেন পূর্বভারতের রানিরা তাদের দেহের উপরাংশ অনাবৃত রাখতেন।

---

[৩৪] ঐ, পৃ. ৬০।

[৩৫] ঐ, পৃ. ৬০।

এ যুগের পরবর্তীকালে রচিত বৈদিক সাহিত্যে আমরা বাংলাদেশকে অসুরদের দেশ হিসেবে বর্ণিত হতে দেখেছি। মহাভারত ও পুরাণ বর্ণিত জন্মকাহিনী অনুযায়ী অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, পুণ্ড্র ও সুহ্ম অসুর জাতি সম্ভূত। অসুরদের তখনকার রাজার নাম 'বলি' আর তার রানির নাম সুদেষ্ণা। মহাভারতে মথুরা নগরীতে অসুর রাজ যদুবংশীয় উগ্রসেন এবং তার পুত্র কংসেরও রাজত্বের সংবাদ পাই। উগ্রসেনের ভ্রাতা দেবক -এর কন্যা দেবকী ও বসুদেবের সন্তান শ্রীকৃষ্ণ (যিনি নিজে কৌরব বংশের হয়েও পাণ্ডবদের পক্ষে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে অংশ নিয়েছিলেন)। বৃহৎ সংহিতা গণনানুসারে ৬৫৩ কল্যব্দে পাণ্ডুপুত্র যুধিষ্ঠিরের রাজ্যাভিষেক হয়েছিল। বর্তমানে (১৪০৯ বঙ্গাব্দে) ৫১০৩ কল্যব্দ চলছে। সুতরাং সেই হিসাব অনুযায়ী যুধিষ্ঠিরের রাজ্য অভিষেকের সময় ছিল ৪৪৫০ বৎসর পূর্বে বা খ্রিষ্টপূর্ব ২৪৪৮ অব্দে। এটা তাম্রাশ্ম যুগের সমকালীন যখন বাংলায় এ সভ্যতার সূচনা ঘটেছিল।[৩৭]

এই সময়কে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের সময় হিসেবেও বিবেচনা করা যেতে পারে, যে যুদ্ধে কৌরব ও পাণ্ডবদের মধ্যে ঘোরতর যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল। এ যুদ্ধেই কুরুবংশোদ্ভূত শ্রীকৃষ্ণ[৩৮] পাণ্ডবদের পক্ষ অবলম্বন করে কৌরবদের পরাজিত করে। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের সময় কৌরবদের নেতা ছিলেন দুর্যোধন। তার পক্ষাবলম্বন করে মগধ-পৌণ্ড্র-বঙ্গ-কামরূপ মিত্রজোট। আর পাণ্ডবদের নেতা ছিলেন যুধিষ্ঠিরসহ পঞ্চপাণ্ডবেরা। কৌরব শ্রীকৃষ্ণ হলেন তাদের মিত্র, যারা বাঙালি তথা অসুরদের মিত্র জোটের ধ্বংস সাধনের জন্য অস্ত্র ধারণ করেছিলেন। এ হল পূর্ব-পশ্চিমের যুদ্ধ, পরাক্রান্ত প্রাচ্য রাষ্ট্র শক্তির বিরুদ্ধে আর্যাবর্ত রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার যুদ্ধ।

মহাভারতে উল্লেখ করা হয়েছে এ সময় প্রবল পরাক্রান্ত মগধরাজ জরাসন্ধের কথা। জরাসন্ধ ছিলেন অসুরদের মিত্রজোটের নেতা। পৌণ্ড্ররাজ বাসুদেব, কামরূপ রাজ ভগবত দত্ত এবং বঙ্গরাজ সমুদ্রসেন এ মিত্রজোট বা রাষ্ট্রসংঘের সদস্য। এরা সবাই ছিল অসুর জাতির রাজা। বিশেষ করে পুণ্ড্র এবং বঙ্গ ছিল অসুর জাতির কেন্দ্রভূমি। অসুর জাতি বা বাঙালিদের সাথে যুদ্ধে বার বার পর্যুদস্ত হয় আর্যরা। ভীত, সন্ত্রস্ত আর্যরা বাঙালিদের দস্যু, রাক্ষস, খোক্কস, দাস, দৈত্য, পক্ষি ইত্যাদি নামে অভিহিত করেছে। এই পৌণ্ড্ররাজ অসুরাধিপতি বাসুদেবের সাথে ব্রাহ্মণ্যবাদী আর্যশক্তির প্রতিভূ শ্রীকৃষ্ণের ছিল আজন্ম শত্রুতা। তারা ছিলেন ঘোরতর প্রতিদ্বন্দ্বী। বাসুদেব ও শ্রীকৃষ্ণের লড়াই হলো প্রাচীন অসুর তথা বাঙালি সংস্কৃতি ও আধিপত্যবাদী আর্যসংস্কৃতির ঘোরতর সংগ্রামের বাহ্যিক রূপ। তাই ড. অতুল সুর তাঁর গ্রন্থে বলেছেন,

> "সিন্ধু সভ্যতার বিলুপ্তি ঘটেনি। বন্যা, মহামারী, ভূমিকম্প ও বৈদিক বিরোধিতা সত্ত্বেও সিন্ধু সভ্যতা জীবিত ছিল। ... রীতিমতো খননকার্য চালালে দেখা যাবে যে সিন্ধু সভ্যতা গঙ্গা উপত্যকার সুদূর প্রত্যন্ত দেশ পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল।"[৩৯]

পরবর্তীকালের উৎখনন তাঁর সে দাবির যথার্থতাই প্রমাণ করে বলে প্রতীয়মান হয়। বিশেষ করে পাণ্ডুরাজার ঢিবিতে ও গঙ্গা অববাহিকার নিম্নাঞ্চলজুড়ে তাম্রাশ্ম সভ্যতার বিভিন্ন নিদর্শন

---

৩৬ অতুল সুর, পৃ. ৬১।

৩৭ ড. অতুল সুরকে অনুসরণ করে হিসাব স্থির করা হয়েছে (দেখুন: অতুল সুর, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৪)।

৩৮ তৎকালীন মথুরা নগরের অধিপতি (যদুবংশীয়) অসুর রাজ উগ্রসেন-এর ভ্রাতা দেবকের কন্যা দেবকী ও বাসুদেবের সন্তান শ্রীকৃষ্ণ। আর কংস হলেন উগ্রসেনের পুত্র। তাকে অসুরাধিপতি বলা হয়েছে উপাখ্যানে।

৩৯ ক্যালকাটা রিভিউ, এপ্রিল-মে, ১৯৩১।

আবিষ্কার এবং অতি সাম্প্রতিক বাংলাদেশের ওয়ারি বটেশ্বরে প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন আবিষ্কারের ফলে এ ধারণা আরো দৃঢ়মূল হয়েছে।

অতুল সুর হরপ্পা সভ্যতার উল্লেখ করে বাংলাদেশে মাতৃকা পূজার প্রাক্কালে উভয় স্থলের সাদৃশ্যের কথা, কুমারী পুতুল এবং শিবপূজার কথা উল্লেখ করে হরপ্পা সভ্যতার সাথে বাংলাদেশের প্রাচীন সভ্যতাকে সমসাময়িক বলেও উল্লেখ করেছেন। বাংলার ও সুমেরের মাতৃদেবীর কল্পনার মধ্যে ৫ ধরনের সাদৃশ্যের কথা তিনি উল্লেখ করেন। তিনি বলেন সেই প্রাচীনকালেই বাঙালিরা ক্রিট দেশে শক্তিপূজার বীজ বপন করে। বাঙলার পাঞ্চমার্কযুক্ত প্রাচীন মূদ্রা ও ক্রিট দেশের তৎকালীন প্রাচীন মূদ্রার সাদৃশ্য, মহেঞ্জোদারোতে প্রাপ্ত হাতির প্রতিকৃতির সাথে প্রাচীন বাঙলার পাঞ্চমার্কযুক্ত মূদ্রায় উৎকীর্ণ হাতির বিশেষ মিল, বঙ্গজনপদের বড়শি ও ধান-চালের হরপ্পা মহেঞ্জোদারো ও চীন দেশে উপস্থিতি ইত্যাদির মাধ্যমে বাঙলার প্রাচীন সভ্যতাকে প্রাচীন মিশর, সুমের, চীন ও সিন্ধু সভ্যতার চেয়েও প্রাচীন বলে দাবি তিনি উত্থাপন করেছেন।

ড. অতুল সুর তাঁর এ বক্তব্যের সপক্ষে যুক্তি তুলে ধরে বলেন মিশর, সুমের, সিন্ধু সমস্ত জায়গাতেই তামা ব্যবহারের নিদর্শন পাওয়া গেছে। তিনি বলেন বাঙলাই ছিল সে যুগের তামার প্রধান আড়ত। তৎকালীন পৃথিবীতে তামার সবচে বড় খনি ছিল বাঙলাদেশে। এ জন্যই বাঙলার সবচেয়ে বড় বন্দর-নগরের নাম ছিল তাম্রলিপ্তি। বাঙলার বণিকেরা ওই তামা সমুদ্রপথে নিয়ে যেত সভ্যতার বিভিন্ন কেন্দ্রসমূহে বিপণনের জন্য। এ থেকে সহজেই অনুমান করা যায় তাম্রাশ্ম সভ্যতার উন্মেষ ঘটেছিল তদানীন্তন বাঙলায়। পুরুলিয়া, মেদিনীপুর, বাকুড়া, বর্ধমান অঞ্চল জুড়ে। তাঁর মতে বাঙলাই তাম্রাশ্ম সভ্যতার জন্মভূমি।[৪০]

বিশেষ করে ধানের চাষ এবং হাতিকে পোষ মানানো ও যুদ্ধে হাতি ব্যবহার তথা হস্তিচালনা বিদ্যা বাঙলায়ই প্রথম শুরু হয়েছিল এ কথা সর্বজন বিদিত। প্রাচীন সাহিত্য এবং কিংবদন্তী অনুযায়ী প্রাচ্য ভারতের পালকাপ্য মুনিই প্রথম হাতীকে বশীভূত করেন। তিনি প্রাচীনকালে হস্তিবিদ্যা নামে একখানা গ্রন্থ রচনা করেন। নিজের ভাষায় পালকাপ্য মুনি তার পরিচয় দিয়েছেন -

> *'হিমালয়ের নিকটে যেখানে লৌহিত্য নদ সাগরাভিমুখে যাইতেছে সেখানে সামগায়ন নামে এক মুনি ছিলেন, তাহার ঔরসে ও এক করেণুর গর্ভে আমার জন্ম। আমি হাতীদের সহিত বেড়াই, তাহারাই আমার আত্মীয়, তাহারাই আমার স্বজন। আমার নাম পালকাপ্য।'*[৪১]

তাছাড়া পরবর্তীতেও দেখা গেছে গ্রিক ও মিশরীয় লেখকগণ উল্লেখ করেছেন হস্তী ছিল বৃহত্তম গঙ্গাভূমি বা গঙ্গারিডির জাতীয় প্রতীক। সুতরাং পালিত পশু হিসাবে হাতির আদি নিবাস বাংলাদেশ। মহেঞ্জোদারোয় হাতীর ব্যাপক উপস্থিতি তাই বাংলাদেশের সাথে ওই সভ্যতার গভীর সম্পর্কের ইঙ্গিত দেয়।

তাহলে কি সভ্যতার গতিধারা বাংলাদেশ অঞ্চল থেকে উৎসারিত হয়ে ক্রমশ সিন্ধু এবং সেখান থেকে সুমের ও কৃষ্ণ সাগর পানে ধাবিত হয়েছিল? সিন্ধু সভ্যতা তাহলে কি প্রাচীন

---

৪০ অতুল সুর, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৫-৭৩।

৪১ অতুল সুর, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৮।

বাঙালি সভ্যতার সম্প্রসারিত অংশ? হরপ্পা সভ্যতাও কি তাহলে বাঙালিদের উপনিবেশ রূপে গড়ে উঠেছিল? এ প্রশ্ন স্বাভাবিকভাবেই উঠে আসে মিশরীয় এবং রোমান সাহিত্যে যখন ১৫৫০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দের আগেই ঐ অঞ্চলে বাঙালিদের উপনিবেশ প্রতিষ্ঠার উল্লেখ করা হয়েছে।

বঙ্গজনপদ, ত্রিভূজ তত্ত্ব ও মানব সভ্যতার কেন্দ্র

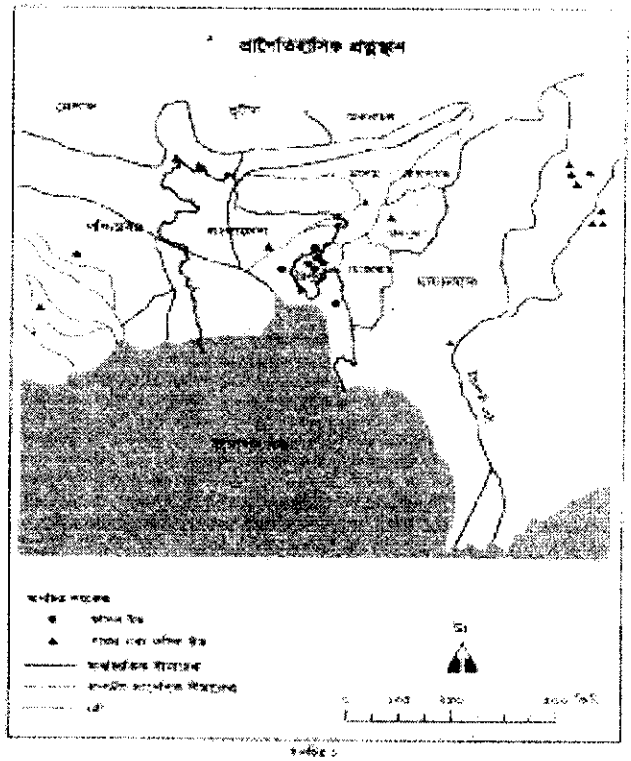

অতুল সুর রোনাল্ড শিলারের উদ্ধৃতি দিয়ে জানাচ্ছেন, থাইল্যাণ্ডে নবোপলীয় সভ্যতার উন্মেষ ঘটেছিল। সি.ও. সয়ার তাঁর 'এগ্রিকালচারাল অরিজিনস এন্ড ডিসপারসান' নামক গ্রন্থে বলেছেন, দক্ষিণ পূর্ব এশীয়াই নবোপলীয় সভ্যতা ও বিপ্লবের সবচে প্রাচীন লীলাভূমি ছিল মনে হয়।

বাংলাদেশেও সম্ভবত প্রত্নপোলীয় যুগ থেকে নবোপলীয় যুগ পর্যন্ত সাংস্কৃতিক বিবর্তনের ধারাবাহিকতা লক্ষ করা যায়। বাংলাদেশের নানান স্থান থেকে প্রত্নপোলীয় যুগের আয়ুধ আবিষ্কৃত হয়েছে। কুমিল্লা জেলায় লালমাই থেকে পশ্চিমবঙ্গের মেদিনীপুর পর্যন্ত অসংখ্য স্থানে প্লাইস্টোসিন ও প্রত্নপোলীয় যুগের হাতিয়ার, জীবাশ্ম ও বিভিন্ন প্রত্নসামগ্রী পাওয়া গেছে। তাছাড়া আগেও উল্লেখ করা হয়েছে উত্তর-পশ্চিম ভারতের শিবালিক গিরিমালা, ইন্দোনেশিয়ার জাভা এবং চীন দেশের চুংকিঙ ট্রায়াঙ্গেলের কেন্দ্রস্থলে বাংলাদেশের অবস্থিতি, প্রাচীন বিশ্ব মানবসভ্যতা বিকাশের কেন্দ্রভূমি হিসেবে বাংলাদেশকে উদ্ভাসিত করে তোলে।

তাছাড়া ১৯৭৮ সালের মেদিনীপুর জেলায় কংসাবতী নদীর বামতীরে সিজুয়া নামক স্থানে বিশ্বের প্রাচীনতম মানব জীবাশ্ম (মানব চোয়ালের ভগ্নংশ) পাওয়ার (নির্ণীত বয়স ১০০০০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দ) হরপ্পা মহেঞ্জোদারোর অনেক পূর্বে প্রত্নপোলীয় যুগে বাংলাদেশে যে মানুষের বসবাস ছিল তার প্রমাণ মেলে।

দার্জিলিং জেলার কালিমপং থেকেও প্রচুর পরিমাণে নবোপলীয় যুগের প্রামাণ্য স্মারক পাওয়া গেছে। সুতরাং প্রত্নপোলীয় যুগ থেকে নবোপলীয় যুগের বিবর্তন যে বাংলাদেশে স্বাভাবিকভাবেই ঘটেছিল সে বিষয়ে সন্দেহ থাকে না।

নবোপলীয় যুগের গ্রামীণ সভ্যতাই পরবর্তীকালে তাম্রাশ্ম যুগের নগর সভ্যতায় বিকশিত হয়েছিল। আর যেহেতু পৃথিবীর বৃহত্তম তাম্রখনি ছিল বাংলাদেশেই, সুতরাং এই বিবর্তন বাংলাদেশেই ঘটেছিল একথা নির্দ্বিধায় বলা চলে। বাঙলার বণিকেরাই বিশ্বের সর্বত্র সভ্যতার অন্যান্য বিকাশমান কেন্দ্রগুলোতে তামা সরবরাহ করত এবং এভাবেই বাংলাদেশ তাম্রাশ্ম যুগের নগর সভ্যতা বিকাশের কেন্দ্রস্থলে পরিণত হয়েছিল।

তাই ড. অতুল সুরের সাথে তাল মিলিয়ে বলা চলে আজ যদি হরপ্পা, মহেঞ্জোদারো, লোথাল, কালিবঙ্গান প্রভৃতি স্থানের মতো পদ্ধতিগতভাবে বাংলাদেশের ওয়ারি-বটেশ্বরসহ বিভিন্ন স্থানে খননকার্য চালানো হয় তাহলে একথা প্রত্যক্ষভাবেই প্রমাণিত হবে তাম্রাশ্ম সভ্যতার বিকাশ বাংলাদেশেই ঘটে এবং বাঙলাই এ সভ্যতার জন্মভূমি।

অসুর মতবাদ

প্রাচ্যদেশীয় জনকে বিশেষত পুণ্ড্র ও বঙ্গ জনপদবাসীকে অসুর নামে অভিহিত করা হয়েছে মহাভারত, পুরাণসহ সংস্কৃত সাহিত্যের বিভিন্ন প্রাচীন গ্রন্থে। পুরাণে প্রাচ্যদেশীয় খ্যাতিমান নৃপতি বাসুদেবকে 'পৌণ্ড্রকাসুর' শোণিতপুর রাজকে 'বালাসুর' এবং কামরূপ প্রাগজোতিষপুরের নৃপতিকে 'নরকাসুর' নামে ডাকা হয়েছে। এ সব গ্রন্থেই অসুরদেরকে দেবতাদের প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে চিহ্নিত করা হয়েছে। এদেরকে বীর্যবান এবং বেদবিরোধী বিজাতীয় একটি স্বতন্ত্র সংস্কৃতির ধারক রূপে দেখান হয়েছে।

আসুরিক তথা বঙ্গজন অধ্যুষিত সংস্কৃতিকে ধ্বংস করতে, এর উপর বেদ-পুরাণ সিদ্ধ আর্যাবর্তের সাংস্কৃতিক আধিপত্য স্থাপনে ও তার বিস্তারে শ্রীকৃষ্ণ অন্যতম প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করে। আর শ্রীকৃষ্ণের প্রধানতম প্রতিদ্বন্দ্বী পৌণ্ড্রকাসুর বাসুদেব, বঙ্গাসুর সমুদ্রসেন, কামরূপের নরকাসুর ভগবত দত্ত এবং মগধাসুর জরাসন্ধের মৈত্রীজোট তথা সার্বিক অর্থে সামগ্রিক বঙ্গ বা অসুর সংস্কৃতি। ভাগবত পুরাণে বর্ণিত অসুর নিধন কাহিনীর মধ্য দিয়ে সর্বত্র তা জ্বলন্তভাবে প্রকাশিত হয়েছে। এ সব কাহিনীতে প্রায় সর্বত্রই নৈতিক, অনৈতিক উপায়ে অথবা ছলচাতুরি বা শঠতার মাধ্যমে সম্ভাব্য সকল উপায়েই দেবতারা অসুর শক্তির বিনাশসাধনে আর্যপ্রতিভূ শ্রীকৃষ্ণকে সহায়তা করেছে।

জ্ঞাতি অসুর জাতির প্রধানতম শত্রু হিসেবে আবির্ভূত হলেন শ্রীকৃষ্ণ। দেবতারা স্বপ্নের মাধ্যমে অসুরাধিপতি কংসকে ক্ষেপিয়ে তুলে যে কাহিনীর সূত্রপাত করেন - দেশীয় সংস্কৃতির বিরোধিতাকারী, বিশ্বাসঘাতক, শিখণ্ডি হিসেবেই তা দাঁড় করিয়ে দেয় শ্রীকৃষ্ণকে। অবশ্য অসুর রাজদের সীমাহীন দুর্নীতি, সন্ত্রাস, হিংস্রতা, অহমিকা ও স্বৈরাচারী নৈরাজ্যের প্রেক্ষাপট রচনা করে শ্রীকৃষ্ণের এ ভূমিকাকে গ্রহণীয় করে তোলার আপ্রাণ প্রচেষ্টাও করা হয়েছে

স্বপ্নতত্ত্বভিত্তিক এ অন্যায় উপাখ্যানে - যা স্পষ্টতই দেব শক্তির প্রতি চরম পক্ষপাত দোষে দুষ্ট।

গীতা-র মতে জগতে 'দেব' ও 'অসুর' এই দুই প্রকার প্রাণীর সৃষ্টি হয়। দৈবী লক্ষণ হল অহিংসা, সত্য, অক্রোধ, ত্যাগ, দয়া ও ক্ষমা - অর্থাৎ সর্বপ্রকার সৎ ও মানবিক গুণাবলী। আর আসুরী প্রকৃতির লক্ষণ - দণ্ড, দর্প, অভিমান, ক্রোধ, অসত্য, অজ্ঞানতা - অর্থাৎ যতপ্রকার বদগুণ মানুষের থাকতে পারে। কিন্তু বাস্তব সত্য হচ্ছে দ্বান্দ্বিক পৃথিবীতে কোন গোষ্ঠীর চারিত্র্য লক্ষণই এ রকম সরল রেখায় অঙ্কন করা সম্ভব নয়।

শতপথ ব্রাহ্মণে অসুরদের বলা হয়েছে প্রজাপতির পুত্র। ছন্দোগ্য উপনিষদে বলা হয়েছে 'দেব' ও 'অসুর' উভয়েই প্রজাপতির দুই সন্তান যারা পরস্পরের সাথে যুদ্ধ করেছিল। ঋগ্‌বেদে অসুরদের সম্পর্কে রয়েছে পরস্পর বিরোধী তথ্য। কোথাও অসুর শব্দটি বেশ সম্মানবাচক, বীরত্ব প্রকাশক পদ হিসেবে ব্যবহৃত - সেখানে দেবরাজ 'ইন্দ্র'কে অসুর হিসেবে চিহ্নিত করা হচ্ছে। আবার অন্যত্র অসুরদেরকে ম্লেচ্ছ, অস্পৃশ্য, দাস, দস্যু, ডাকাত, চোর, দৈত্য, পক্ষি, ইতর প্রাণী ইত্যাদিরূপে চিত্রিত করা হচ্ছে। মজার ব্যাপার, ঋগ্‌বেদে অসুরের এই দ্বিতীয় অর্থ সর্বদাই প্রাচ্যবাসী, বঙ্গ ও মগধ জনপদের অধিবাসীদের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয়েছে। কারণ স্পষ্টতই বঙ্গ তথা প্রাচ্য দেশীয় সংস্কৃতির প্রতি বিদেশী ও আধিপত্যবাদী আর্যসংস্কৃতির মুখপত্র ঋগ্‌বেদের বিদ্বেষপ্রসূত ও উদ্দেশ্য প্রণোদিত মনোভাব।

মনের কোণে এখানে একটি প্রশ্ন খুবই স্বাভাবিকভাবে উঁকি দেয়। ইন্দ্র একসময়ে এ দেশেরই বড় বীর ছিলেন কিনা, যিনি পরবর্তীতে আর্যপক্ষে যোগ দিয়েছিলেন? কারণ এ রকম ঘটনা তো শ্রীকৃষ্ণের বেলায়ও ঘটেছিল - দেবতাদের চক্রান্তে পড়ে যিনি পাণ্ডবদের পক্ষ হয়ে নিজ জ্ঞাতিগোষ্ঠী ও সংস্কৃতির বিনাশ সাধন করেছিলেন! মনে এরূপ প্রশ্নের উদ্রেক হওয়া অবান্তর নয় এ বিষয়ে যুক্তি রয়েছে। ইরান-ভারততত্ত্ববিদগণ দেখাবার চেষ্টা করেছেন যে প্রাচীন পারসিক (আবেস্তী) ভাষায় 'দএব' (বা সংস্কৃতের দেব) এর অর্থ দৈত্য, আর 'অসুর' অর্থ দেবতা। অর্থাৎ পারসিক 'অসুর' সংস্কৃত সাহিত্যের দেবতার সমার্থক। কী অদ্ভূত বৈপরীত্য!

কোনো কোনো গবেষকের ধারণা পারসিক দৈত্য বা 'দেব' অনুসারীদের প্রতিনিধি হলো এই আর্যরা যারা ভারতে এসে এ দেশীয় 'অসুর' জাতিগোষ্ঠীর প্রবল প্রতিরোধের মুখে পড়ে তাদেরকে ইতরবাচক বিভিন্ন বিশেষণে ভূষিত করে। কারণ বঙ্গ থেকে পারস্য পর্যন্ত তখনকার বিদ্যমান সাংস্কৃতিক ঘনিষ্ট সম্পর্কের কারণে সুসভ্য জাতিগোষ্ঠী ও রাষ্ট্রশক্তির পারসিক অর্থে অসুর হওয়াই স্বাভাবিক। আর যাযাবর, বর্বর, মেষ ও গবাদিপশু পালক আর্যদের ভাগ্যে 'দএব' বা দৈত্য আখ্যা জুটে যাওয়া খুব অস্বাভাবিক মনে হয় না।

প্রাচীন 'অসুর' বা আসিরীয় দেশের প্রধান উপাস্য দেবতার নামও ছিল অসুর। এদের অনেক রাজার নাম পাওয়া যায় যেমন: অসুর-বাণীপাল, অসুর-নাসিরপাল, অসুর-উবলিত প্রভৃতি। কোনো কোনো গবেষকের মতে অসুরেরা তাদের আদিভূমি প্রাচ্যভারত তথা বঙ্গ জনপদ থেকে এসব অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েছিলেন এবং সভ্যতার বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছিলেন।

ঋগ্‌বেদে অসুরদেরকে মায়া ও ঐন্দ্রজালিক শক্তির অধিকারী এবং স্থাপত্যবিদ্যায় কুশলী বলে উল্লেখ করা হয়েছে।[৪২] মহাভারতে বর্ণিত মায়াসুর বা ময়দানবকে এসব বিষয়ে অত্যন্ত পারদর্শী হিসেবে চিত্রিত করা হয়েছে।

ঋগবেদ, মহাভারত ও পরবর্তী বৈদিক সাহিত্যে অসুরদের অত্যন্ত স্পষ্টভাষায় বেদহীন ও বেদবিরোধী একটি ভিন্ন-সংস্কৃতির ধারক হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। মূলত লোকায়ত দর্শনকে ঘিরেই অসুরদের সামাজিক, রাজনৈতিক ও আধ্যাত্মিক ক্রিয়া কর্ম আবর্তিত হতো। এই লোকায়ত দর্শনেরই একটি শাখা প্রাচ্যভারতীয় তন্ত্রবাদ যা থেকে দেহার্থবাদ বা দেহতত্ত্ব, জড়বাদ, নাস্তিক্যবাদ ইত্যাদি উপধারারও জন্ম হয়। তন্ত্রবাদের এ ধারা পূর্বভারতে আমাদের এই বঙ্গজনপদেই বিকশিত হয়েছিল বলে অনেকের ধারণা এবং লোকায়ত দর্শন তথা তন্ত্রবাদ অসুরদের চিন্তা ও বিশ্বাসের গভীরে নিহিত ছিল।

অসুর মত বা তন্ত্রমতের চিন্তা ধারায় দুটি শাখা (১) আত্মতত্ত্ব বা দেহতত্ত্ব এবং (২) সৃষ্টিতত্ত্ব। দেহতত্ত্বের মূল বক্তব্য 'যাহা আছে দেহ ভাণ্ডে, তাহা আছে ব্রহ্মাণ্ডে'। এমনকি আধুনিক কালের বৈষ্ণব ও সহজিয়া প্রভৃতি প্রচ্ছন্ন ধর্মমতসমূহেও (Obscure religious cult) তন্ত্রমতের মূলসূত্র খুঁজে পাওয়া যায়। যেমন: সহজিয়াদের একটি গানে ব্যক্ত হয়েছে : 'পুরুষ ছাড়িয়া প্রকৃতি হবে। একদেহ হয়ে নিত্যতে যাবে।' আর বিশুদ্ধ তন্ত্রমতে : 'বামাভূত্বা যজ্যে পরাস' - এই দুই উক্তির মধ্যে পার্থক্য নেই।[৪৩]

ভারতীয় দর্শন ও ঐতিহ্যের দু'টি ধারা: একটি মাতৃ বা প্রকৃতি প্রধান তান্ত্রিক ধারা, অপরটি পুরুষ প্রধান বৈদিক ধারা। প্রথমটির উন্মেষ ও বিকাশ ঘটেছে প্রাচ্য ভারতবর্ষে বঙ্গজনপদসমূহকে কেন্দ্র করে। আর দ্বিতীয়টির বিকাশ ও পরিচর্যা হয়েছে আর্যাবর্তে - বিজাতীয় উৎস থেকে যার অনুপ্রবেশ ঘটেছিল এ দেশে।

প্রত্নতাত্ত্বিক সাক্ষ্যে দেখা যায় প্রাচীন বঙ্গদেশে আদি মাতৃকাদেবীর উপাসনা হত। মহেঞ্জোদারো ও হরপ্পায়ও মাতৃদেবীর মূর্তি আবিস্কৃত হয়। বাংলাদেশে এখনো অনুরূপ ক্ষুদ্র মূর্তি তৈরি হয়। এগুলিকে কুমারী পুতুল বলে। প্রাচীন বঙ্গে 'কুমারী মাতা'র পূজার রেওয়াজ ছিল। বাঙালি হিন্দুরা এখনো দুর্গোৎসবের সময় 'কুমারী' পূজা করে থাকেন।

বাংলা ও সুমের দেশীয় মাতৃপূজার মধ্যেও সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। উভয় দেশেই মাতৃকাদেবীকে কুমারী বলে কল্পনা করা হতো। উভয় দেশেই মাতৃদেবী শক্তিরূপিনী এবং যুদ্ধনিপুণা - যেখানে মাতৃকাদেবী রূপান্তরিত হয়েছে 'নারী শক্তিরূপিনী' একটি সত্তায় বা এক অনাদি সত্য প্রকৃতিতে। বিপরীত চিরন্তন সত্তা 'পুরুষে'র সাথে মিলিত হয়ে যে শক্তি বিশ্বের স্রষ্টা এমনকি দেবতাদেরও স্রষ্টা ও মাতা অর্থাৎ জগদম্বা বা জনগন্মাতায় পরিণত হয়েছে। এই শক্তিবাদও মূলত তন্ত্রবাদ তথা অসুর দর্শনের ওপর প্রতিষ্ঠিত; যে শক্তিতত্ত্বের মূলসূত্র হল 'যৌন দ্বৈতভাব'।

সুমেরের লিপিতে মাতৃকা দেবীকে যুদ্ধবাহিনীর নেত্রী বলে সম্বোধন করা হয়েছে আর বাংলাদেশের দুর্গামাতাও দশ প্রকার আয়ুধ সজ্জিত রণরঙ্গিনী, অপশক্তি ও মহিষমর্দিনী। উভয় দেশের মাতৃদেবীর সাথে পর্বতের ঘনিষ্ঠ যোগ। সুমেরে তিনি 'পর্বতের দেবী' আর ভারতীয় পুরাণে তিনি 'দেবী পার্বতী' হিমালয় কন্যা। উভয় দেশে দেবীর বাহন সিংহ এবং তাদের ভর্তাদের বাহন বৃষ।

---

৪২ অজয় রায়, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩১।

৪৩ ঐ, পৃ. ১৩২।

ঋগবেদ, মহাভারত ও পরবর্তী বৈদিক সাহিত্যে অসুরদের অত্যন্ত স্পষ্টভাষায় বেদহীন ও বেদবিরোধী একটি ভিন্ন-সংস্কৃতির ধারক হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। মূলত লোকায়ত দর্শনকে ঘিরেই অসুরদের সামাজিক, রাজনৈতিক ও আধ্যাত্মিক ক্রিয়া কর্ম আবর্তিত হতো। এই লোকায়ত দর্শনেরই একটি শাখা প্রাচ্যভারতীয় তন্ত্রবাদ যা থেকে দেহার্থবাদ বা দেহতত্ত্ব, জড়বাদ, নাস্তিক্যবাদ ইত্যাদি উপধারারও জন্ম হয়। তন্ত্রবাদের এ ধারা পূর্বভারতে আমাদের এই বঙ্গজনপদেই বিকশিত হয়েছিল বলে অনেকের ধারণা এবং লোকায়ত দর্শন তথা তন্ত্রবাদ অসুরদের চিন্তা ও বিশ্বাসের গভীরে নিহিত ছিল।

অসুর মত বা তন্ত্রমতের চিন্তা ধারায় দুটি শাখা (১) আত্মতত্ত্ব বা দেহতত্ত্ব এবং (২) সৃষ্টিতত্ত্ব। দেহতত্ত্বের মূল বক্তব্য 'যাহা আছে দেহ ভাণ্ডে, তাহা আছে ব্রহ্মাণ্ডে'। এমনকি আধুনিক কালের বৈষ্ণব ও সহজিয়া প্রভৃতি প্রচ্ছন্ন ধর্মমতসমূহেও (Obscure religious cult) তন্ত্রমতের মূলসূত্র খুঁজে পাওয়া যায়। যেমন: সহজিয়াদের একটি গানে ব্যক্ত হয়েছে : 'পুরুষ ছাড়িয়া প্রকৃতি হবে। একদেহ হয়ে নিত্যতে যাবে।' আর বিশুদ্ধ তন্ত্রমতে : 'বামাভূত্বা যজ্যো পরাস' - এই দুই উক্তির মধ্যে পার্থক্য নেই।[৪৩]

ভারতীয় দর্শন ও ঐতিহ্যের দু'টি ধারা: একটি মাতৃ বা প্রকৃতি প্রধান তান্ত্রিক ধারা, অপরটি পুরুষ প্রধান বৈদিক ধারা। প্রথমটির উন্মেষ ও বিকাশ ঘটেছে প্রাচ্য ভারতবর্ষে বঙ্গজনপদসমূহকে কেন্দ্র করে। আর দ্বিতীয়টির বিকাশ ও পরিচর্যা হয়েছে আর্যাবর্তে - বিজাতীয় উৎস থেকে যার অনুপ্রবেশ ঘটেছিল এ দেশে।

প্রত্নতাত্ত্বিক সাক্ষ্যে দেখা যায় প্রাচীন বঙ্গদেশে আদি মাতৃকাদেবীর উপাসনা হত। মহেঞ্জোদারো ও হরপ্পায়ও মাতৃদেবীর মূর্তি আবিস্কৃত হয়। বাংলাদেশে এখনো অনুরূপ ক্ষুদ্র মূর্তি তৈরি হয়। এগুলিকে কুমারী পুতুল বলে। প্রাচীন বঙ্গে 'কুমারী মাতা'র পূজার রেওয়াজ ছিল। বাঙালি হিন্দুরা এখনো দুর্গোৎসবের সময় 'কুমারী' পূজা করে থাকেন।

বাংলা ও সুমের দেশীয় মাতৃপূজার মধ্যেও সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। উভয় দেশেই মাতৃকাদেবীকে কুমারী বলে কল্পনা করা হতো। উভয় দেশেই মাতৃদেবী শক্তিরূপিনী এবং যুদ্ধনিপুণা - যেখানে মাতৃকাদেবী রূপান্তরিত হয়েছে 'নারী শক্তিরূপিনী' একটি সত্তায় বা এক অনাদি সত্য প্রকৃতিতে। বিপরীত চিরন্তন সত্তা 'পুরুষে'র সাথে মিলিত হয়ে যে শক্তি বিশ্বের স্রষ্টা এমনকি দেবতাদেরও স্রষ্টা ও মাতা অর্থাৎ জগদম্বা বা জনগন্মাতায় পরিণত হয়েছে। এই শক্তিবাদও মূলত তন্ত্রবাদ তথা অসুর দর্শনের ওপর প্রতিষ্ঠিত; যে শক্তিতত্ত্বের মূলসূত্র হল 'যৌন দ্বৈতভাব'।

সুমেরের লিপিতে মাতৃকা দেবীকে যুদ্ধবাহিনীর নেত্রী বলে সম্বোধন করা হয়েছে আর বাংলাদেশের দুর্গামাতাও দশ প্রকার আয়ুধ সজ্জিত রণরঙ্গিনী, অপশক্তি ও মহিষমর্দিনী। উভয় দেশের মাতৃদেবীর সাথে পর্বতের ঘনিষ্ঠ যোগ। সুমেরে তিনি 'পর্বতের দেবী' আর ভারতীয় পুরাণে তিনি 'দেবী পার্বতী' হিমালয় কন্যা। উভয় দেশে দেবীর বাহন সিংহ এবং তাদের ভর্তাদের বাহন বৃষ।

---

৪২ অজয় রায়, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩১।

৪৩ ঐ, পৃ. ১৩২।

এসব চমকপ্রদ সাদৃশ্য থেকে প্রতীয়মান হয় সুদূর অতীতে বঙ্গদেশ থেকে এ সভ্যতা ও সংস্কৃতি সুমের দেশে বাহিত হয়েছিল। কারণ সুমেরের প্রাচীন কিংবদন্তিতে বলা হয় সুমেরবাসীরা পূর্বদিকের কোন পার্বত্য দেশে অভিনিবিষ্ট হয়েছিল (সিংহলীরা যেমন বিজয় সিংহকে তাদের পূর্বপুরুষ হিসেবে স্মরণ করে)। যোগিনীতন্ত্রে 'সোমার' দেশের সাথে সুমের দেশের ধ্বনিগত সাদৃশ্যের বিষয়টিকেও এর সপক্ষে যুক্তি হিসেবে উপস্থাপন করা হয়েছে। যোগিনীতন্ত্রের মতে সৌমার দেশ - পশ্চিমে শোনকুশি নদী, পূর্বে করতোয়া নদী, উত্তরে হিমালয় পর্বতমালা ও দক্ষিণে গারো-খাসিয়া এই সীমার মাঝে অবস্থিত। তাছাড়া অসুর ও সুমেরীয়দের মধ্যে মৃতদেহ সৎকার প্রথার অপূর্ব সাদৃশ্য বিদ্যমান ছিল। এসব কিছু থেকে প্রতীয়মান হয় বঙ্গজনপদ থেকে সুমের অঞ্চলেও লোকায়ত সংস্কৃতির অভিগমন ঘটেছিল।

অসুর সংস্কৃতি ভারতবর্ষের আর্যসংস্কৃতির বহুপূর্ববর্তী ও উন্নত সংস্কৃতি হিসেবে বিবেচিত হতো। কারণ অসুরদের মধ্যেই প্রথম রাষ্ট্রব্যবস্থা বা রাজতন্ত্রের উত্তরণ ঘটে। এই প্রাচ্যদেশীয় প্রাচীন ও প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রশক্তির কাছেই আর্যশক্তির বার বার পরাজয় ঘটেছে। ঐতেরেয় ব্রাহ্মণে বলা হয়েছে দেবাসুর যুদ্ধে দেবতাদের বারবার পরাজিত হওয়ার কারণ দেবতাদের মধ্যে কোন রাজা নেই (অ-রাজত্বং), তাই অসুরদের মতো তারাও একজন রাজা নির্বাচন করতে রাজি হল (রাজ্যনাম করবামাহম ইতি যতেতি)। অর্থাৎ আর্যদের রাষ্ট্র বিকাশের ধারণা পূর্বভারতীয় তথা বাঙালিদের কাছ থেকে ধার করা।

ভাষার দিক দিয়েও বাঙালিদের স্বাতন্ত্র্য ছিল। ঐতেরেয় আরণ্যকে কথিত 'বায়ংসি' পদ দ্বারা বঙ্গ ও মগধবাসীদের ভিন্ন সংস্কৃতি ও ভাষার অধিকারী একটি জনকে বুঝানো হয়েছে। আর্য্যমঞ্জুশ্রীকল্পে স্পষ্ট করে বলা হয়েছে - এই ভাষা হল অসুর জাতির ভাষা (অসুর নাম ভবেৎবাচ গৌড় - পুণ্ড্রোদ্ভবা সদা')।

গ্রিয়ার্সনের শ্রেণিবিন্যাস অনুসারে আধুনিক বাংলা, মারাঠী, গুজরাটি, সিন্ধী ভাষা নিকটাত্মীয়তা সূত্রে সম্পর্কিত - এদের বলা হয় বহির্মণ্ডলীয় বা বহির্গোষ্ঠী। অন্যদিকে পরস্পর নিবিড়ভাবে সম্পর্কিত হিন্দিভাষাসমূহকে (হরিয়ানি, কনৌজ, হিন্দুস্তানি, পূর্ব পাঞ্জাবি) অভিহিত করা হয়েছে অন্তর্মণ্ডলীয় বা অনুগোষ্ঠী হিসেবে। গবেষকদের ধারণা অসুর তথা প্রাকৃত ভাষা থেকেই নানা প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে বহির্মণ্ডলীয় এ আধুনিক ভাষাসমূহের উদ্ভব ঘটেছে।

পঞ্চবিংশতি ব্রাহ্মণে উল্লেখ করা হয়েছে যে 'ব্রাত্যরা' হল 'প্রাকৃত' ভাষাভাষী। ব্রাত্যজন যে প্রাচ্যদেশীয় ও উন্নত এবং স্বতন্ত্র সংস্কৃতির অধিকারী বঙ্গজন এবং মগধবাসীদের বুঝানো হয়েছিল অথর্ববেদের প্রশংসা থেকে সে কথাও স্পষ্ট ভাবেই বুঝা যায়।[৪৪]

তাই বলা যায়, শুধু রাজ্য স্থাপন নয়, প্রাচ্যের অসুর রাষ্ট্রশক্তি ব্রাহ্মণ্যবাদী আর্যশক্তির আগ্রাসন প্রতিহত করে সাম্রাজ্য বিস্তারেও সচেষ্ট ছিলেন। ঐতেরেয় ব্রাহ্মণের কালে উশীনর, কুরা, পাঞ্চাল প্রভৃতি উত্তর ভারতীয় আর্য বসতি অঞ্চলে যখন ধারণাগতভাবে কোনো রাজ্যেরই ভালমত বিকাশ ঘটেনি, তখন প্রাচ্যদেশীয় (প্রাচ্যম দিশি) রাজারা সাম্রাজ্যে অধিষ্ঠিত। তাদের মধ্যে সার্বভৌমত্বের ধারণার পরিপূর্ণ বিকাশ ঘটেছে। সে সময়ই প্রাচ্যদেশীয় নৃপতির উপাধি 'একরাট', সম্রাট ইত্যাদি। অথর্ববেদেও ইঙ্গিত রয়েছে এই অসুর রাষ্ট্রশক্তির হাতেই বৈদিক আর্যরা বার বার পরাভূত হয়েছে।

---

৪৪ অজয় রায়, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪২।

গ্রামকেন্দ্রিক জীবন থেকে প্রাথমিক প্রশাসনের উন্মেষ

সমাজতাত্ত্বিক বিবেচনায় বিচার করলে দেখা যায়, গ্রামই বাংলার প্রাণ। বাঙালির ইতিহাস ও সংস্কৃতির আদিম ও মধ্য যুগে গ্রামকে কেন্দ্র করেই বাঙালি জীবনধারা আবর্তিত হয়েছে। আধুনিক যুগেও বাংলাদেশের সমাজ গ্রামকেন্দ্রিক। সভ্যতার সূচনালগ্নে পৃথিবীর অন্যান্য সকল সভ্যতা বিকাশের ন্যায় বাঙালিরাও গোষ্ঠী বা যূথবদ্ধ হয়ে জীবন যাপন করত।

মাতৃকেন্দ্রিক সমাজে শিকার, কৃষিকাজ এবং পশুপালন ছিল মানুষের জীবিকা। সম্ভবত একই পরিবারভুক্ত লোকজন ও তাদের জ্ঞাতিবর্গ মিলে যে প্রাথমিক বসতি গড়ে তোলে সেগুলিই কালক্রমে বিকশিত হয়ে গ্রামে রূপান্তরিত হয়। সমাজ বিকাশের গতিধারায় গ্রাম এখনও আমাদের দেশের তৃণমূল প্রশাসনের কেন্দ্রবিন্দু।

সাধারণত ফসলের মাঠ, নদী, খাল, বিল, জলাশয়, জলপ্রবাহ, খাদ্যের উৎস অথবা বনাঞ্চল ঘিরে বসতি গড়ে উঠত। কালক্রমে লোকসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে গ্রামগুলিতে কৌম বা গোষ্ঠী জীবন প্রতিষ্ঠা পায়। এই কৌম চেতনার আশ্রয়ই গ্রাম। আমাদের সমাজে কৌম চেতনা আজো সক্রিয়ভাবে বহমান:

> আজ আমরা যাহাদের বাঙালি বলিয়া জানি . . . বহুদিন পর্যন্ত ইহাদের অধিকাংশই ছিল কৌমবদ্ধ, গোষ্ঠীবদ্ধ জন এবং শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া ইহারা একান্ত কৌম জীবনেই অভ্যস্ত হইয়া আসিয়াছিল।[৪৫]

গ্রামে ধীরে ধীরে জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে বসতি ও ফসলি মাঠের বিস্তৃতি ঘটে, বৃদ্ধি পায় ফসলি জমির চাহিদা। এভাবে আরণ্যভূমি পরিষ্কার এবং নতুন গ্রাম ও আবাদি জমির পত্তন ঘটে। ভয়ভীতি, নানা প্রকার বিপদ ও উৎপাত থেকে আত্মরক্ষার জন্য গ্রামবাসী সাধারণত ঘন সন্নিবিষ্ট হয়ে বাস করত। একই বৃত্তির সমশ্রেণির লোকজন মিলে একেকটি পাড়া গড়ে ওঠে। ক্রমে সমাজ বিভিন্ন বৃত্তি ও পেশায় বিভক্ত হয়ে যাওয়ায় একই গ্রামে বিভিন্ন পেশার ও জীবিকার মানুষের সমাবেশ ঘটে। এ ধরনের পাড়া ও গ্রামের সংগঠন প্রাচীন কৌম সমাজেরই দান :

> প্রাগৈতিহাসিক এবং পরবর্তী প্রাচীন যুগে কৃষি নির্ভর গ্রামগুলিতে সাধারণত ভূম্যাধিকারী, মহত্তর, কুটুম্ব, কৃষক, ক্ষেত্রকর, সমাজ-শ্রমিক, ভূমিহীন কৃষি শ্রমিক এবং কিছু কিছু কৃষি ও গৃহস্থ কর্মসম্পৃক্ত শিল্পী, নাপিত, রজক, হাড়ি, চণ্ডাল এবং ডোমরা বসবাস করত। ইহাদের কামনা বাসনা, ধ্যান ধারণা ইত্যাদি সমস্তই কৃষিকর্ম এবং গ্রাম্য গার্হস্থ্য ধর্মকে আশ্রয় করিয়াই গড়িয়া উঠিত। (প্রাগুক্ত: পৃ. ২৮২)

গরু, লাঙল, আখমাড়াই যন্ত্র, তকমা ও তাঁত হল গ্রামের কৃষি ও কুটির শিল্পের আদি উপকরণ। এ জন্য হাজার হাজার বছর ধরে বাঙলার গ্রামের অর্থনৈতিক ও অবকাঠামোগত অবস্থা প্রায় একই ধরনের স্থবির হয়ে আছে। গ্রামের পাশ দিয়ে প্রবাহিত নদী, খাল, জলপ্রবাহ, আর পায়ে চলার পথ। কোনো গ্রামের বাইরে বসত হাট। সমুদ্র তীরে গ্রামের পাশে লবণের গর্ত। মন্দির, উপাসনালয়, টোল, চতুষ্পাঠী, বৌদ্ধ বিহার, নদী বা খাল পার

---

[৪৫] নীহার রঞ্জন রায়, বাঙ্গালীর ইতিহাস, আদিপর্ব, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা ৭০০০৭৩, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৪০২, পৃ. ৬৯৬-৬৯৭।

হওয়ার জন্য খেয়াঘাট, জলবাণিজ্যের কেন্দ্র হলে নদীর ঘাট বা সমুদ্রের খাড়িতে ঘটতো অসংখ্য নৌকার সমাবেশ।

সব গ্রামের আয়তন ও লোকসংখ্যা সমান নয়। অধিবাসীদের পেশা ও ভূ-প্রকৃতি অনুসারে গ্রামের প্রকৃতিও হতো ভিন্ন ভিন্ন। প্রাচীন লিপিমালায় অসংখ্য গ্রামের উল্লেখ আছে। গ্রামের রকম ফের, ভৌগোলিক অবস্থান, প্রকৃতি, বিদ্যমান সমস্যার ধরন ইত্যাদি বিবেচনায় পরবর্তীতে রীতিমত গ্রাম প্রশাসন ও তারও পরে যৌথ গ্রাম প্রশাসন গড়ে ওঠার স্বাক্ষর স্পষ্ট।

কালক্রমে অর্থনৈতিক ও সামাজিক সম্পর্ক বিকাশ এবং গ্রামে পরিবার ও জনসংখ্যা বৃদ্ধির পাশাপাশি আনুষঙ্গিক জটিলতা বৃদ্ধির প্রেক্ষাপটেই সম্ভবত গ্রাম প্রশাসন বিকশিত হয়। ফলে প্রাচীন গ্রাম প্রশাসন, সরকার, পরিষদ, পঞ্চায়েত ইত্যাদি প্রাথমিক বা আদিম প্রশাসনের উন্মেষ ঘটে।

সম্ভবত গ্রামবাসীর শান্তি-শৃঙ্খলা বিধান, বিবাদ মিমাংসা নিরসন ইত্যাদি কারণে ভ্রূণাকারে আদিম গ্রাম প্রশাসন গড়ে ওঠে। প্রভাবশালী পরিবার বা গোষ্ঠীর প্রধানই প্রথম গ্রামের মোড়ল, গ্রাম প্রধান বা গ্রামের স্বতঃপ্রণোদিত প্রশাসক হিসেবে কাজ শুরু করে। এরাই প্রশাসনের আদিম স্থপতি। এখনও এদের প্রতিনিধি মোড়ল বা মাতবরদের গ্রামাঞ্চলে সক্রিয় দেখা যায়।

প্রাচীন লিপিতে গ্রাম প্রশাসনের প্রধানের উপাধি 'গ্রামিক'। প্রাচীন বাংলার অনেক লিপিতে 'পঞ্চকুল', 'অষ্টকুল' নামেও গ্রামীণ প্রশাসনের উল্লেখ রয়েছে। সম্ভবত পাঁচজন প্রতিনিধি সমন্বয়ে গঠিত যে গ্রামীণ প্রশাসন তাকে 'পঞ্চকুল' আখ্যা দেয়া হয়। এভাবেই পঞ্চায়েত প্রশাসনের উদ্ভব ঘটে থাকতে পারে। অনুমান করতে কষ্ট হয় না, অনুরূপভাবে অষ্টকুল-এর সদস্য সংখ্যা ছিল আটজন।

বৈদিক সাহিত্যে রাজার নির্বাচকদের তালিকায় 'গ্রামণী' বা গ্রামের মোড়লেরও নাম উল্লেখ আছে।[৪৬] 'গ্রামণী' ঋগ্‌বৈদিক যুগেও ছিলেন। গ্রামণীদের প্রতিনিধিকে রাজার আমলা সভায় 'রত্ন' বিবেচনা করা হতো সে সময়।[৪৭]

অষ্টম শতকে পাল বংশের রাজত্বকাল গ্রাম-প্রশাসনে আমূল রদবদল ঘটে। এ সময় দশটি গ্রাম নিয়ে তৃণমূল পর্যায়ে গ্রামীণ প্রশাসন গড়ে তোলা হয় যার প্রধান প্রশাসক 'দশগ্রামিক'। আবার ৪টি গ্রাম নিয়ে কোনো কোনো ক্ষেত্রে গ্রামীণ প্রশাসনের সূত্রপাত ঘটে, যে প্রশাসনের প্রধানের নাম চতুরক।[৪৮]

---

৪৫ নীহার রঞ্জন রায়, বাঙ্গালীর ইতিহাস, আদিপর্ব, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা ৭০০০৭৩, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৪০২, পৃ. ৬৯৬-৬৯৭।

৪৬ ভারতবর্ষের ইতিহাস, পৃ. ৫৩।

৪৭ দিলীপ কুমার গঙ্গোপাধ্যায়, পৃ. ১২৬।

৪৮ ড. মোহাম্মদ হাননান, ১৯৯৮, পৃ. ৪২।

নগর ও নগর প্রশাসন

প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকেই বৃহৎ বাংলায় বিভিন্ন স্থানে নগর সভ্যতার পত্তন ঘটে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নদী, সমুদ্র তীর এবং স্থল যোগাযোগের সংযোগ স্থলে নগরগুলোর উন্মেষ ঘটে। বিশেষ করে নদী তীরবর্তী অঞ্চলে সভ্যতা বিকাশের ইতিহাস বিশ্বের প্রায় সর্বত্র। এ পর্যন্ত প্রাপ্ত বিশ্ব সভ্যতার প্রাচীনতম চারটি কেন্দ্রও নদী তীরেই গড়ে উঠেছিল। যেমন:

(১ নীল নদের তীরে মিশরীয় সভ্যতা (খ্রি. পূ. ৪০০০ অব্দ),

(২) ইরানের পশ্চিমে (বর্তমানে ইরাকে) ইউফ্রেটিস ও টাইগ্রিস উপত্যকায় মেসোপটেমীয় বা সুমেরীয় সভ্যতা (খ্রি. পূ. ৪০০০ অব্দ),

(৩) হোয়াংহো বা পীত নদীর তীরে চীনা সভ্যতা (খ্রি. পূ. ৩০০০ অব্দ), এবং

(৪) সিন্ধু নদীর তীরে ভারতীয় হরপ্পা সভ্যতা (খ্রি. পূ. ৩০০০ অব্দ)।[৪৯]

এর মধ্যে হরপ্পা সভ্যতা ও সুমেরীয় সভ্যতার সাথে গঙ্গা নদীর নিম্ন অববাহিকায় প্রাচ্যদেশীয় অসুর তথা প্রাচীন বাঙালি সংস্কৃতি ও সভ্যতার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ যোগাযোগ ছিল। চীনা সভ্যতার সাথেও বাঙালি সভ্যতার যোগাযোগ ছিল। এ সভ্যতা ঐ চার সভ্যতারও পূর্ববর্তী সে বিষয়ে সাক্ষ্য প্রমাণ ক্রমশ স্পষ্টতর হয়ে উঠছে। প্রাচীন 'গঙ্গারিডি' সভ্যতাও বঙ্গীয় সভ্যতার ধারাবাহিকতার স্মারক বলে মনে হয়।

অপরপক্ষে প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকেই বাংলার জনপদসমূহে বিভিন্ন নগর গড়ে ওঠার প্রমাণ পাওয়া যায় সাহিত্যিক দলিল, পর্যটকদের বর্ণনা, ভূমিদান পট্টোলি, তাম্রশাসন ও লিপিসহ বিভিন্ন প্রত্ন নিদর্শন এবং সভ্যতা, বন্দর ও নগরসমূহের ধ্বংসস্তূপ আবিষ্কারের মাধ্যমে।

রাষ্ট্রীয় শাসনকার্য, দেশীয় ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্যিক উদ্দেশ্য সাধন, রাজধানী ও বিজয় স্কন্ধবার (Millitary Encampment) প্রতিষ্ঠা, সামরিক প্রয়োজন, শিল্প প্রসার এবং ধর্মতীর্থ ও শিক্ষার কেন্দ্র প্রভৃতি প্রতিষ্ঠার জন্য এক বা একাধিক কারণে প্রাগৈতিহাসিক বাংলায় এ সব নগর গড়ে ওঠে। নগরগুলো প্রধানত গঙ্গা, পদ্মা, যমুনা, ভাগিরথী ও মেঘনা ধারার তীরবর্তী এলাকায় গড়ে ওঠে। এছাড়া স্বরস্বতী, কালিগঙ্গা, গোমতী, তিস্তা, করতোয়া, ধলেশ্বরী, ইছামতী, দামোদর, সুবর্ণরেখা, পুনর্ভবা, মহানন্দা, গড়াই, মধুমতি প্রভৃতি নদীর তীরেও বিভিন্ন নগর বিকশিত হয়। নগরগুলি সাধারণত প্রশাসন, ব্যবসাবাণিজ্য এবং সামরিক কর্মকাণ্ডের প্রধান কেন্দ্রস্থল হিসেবে গড়ে ওঠে।

নগরের বাসিন্দা ছোট বড় সামন্ত, রাজকর্মচারী, শ্রেষ্ঠী, কুলিক, সার্থবাহ, শিল্পী, বণিক প্রভৃতি গোষ্ঠী, বৃত্তি ও পেশার ব্যক্তিবর্গ। এদের বিভিন্ন দপ্তর ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানকে আশ্রয় ও উপলক্ষ করে স্থায়ী ও অস্থায়ী অন্যান্য বহু পেশার লোকও নগরে বাস করত।

বিভিন্ন উৎস থেকে প্রাপ্ত তথ্যানুসারে প্রাগৈতিহাসিক ও প্রাচীন যুগে বৃহৎবঙ্গ জুড়ে যেসব নগর গড়ে ওঠে সেগুলোর মধ্যে অন্যতম:

---

[৪৯] ড. মোহাম্মদ হাননান, বাঙালির ইতিহাস, অনুপম প্রকাশনী, ঢাকা ১৯৯৮, প্রথম সংস্করণ, পৃ. ১৭।

১. উত্তর বঙ্গ: পুণ্ড্রনগর, লক্ষণাবতী, গৌড়, লখনৌতি, কোটিবর্ষ, দেবকোট, বাণগড়, পঞ্চনগর (পেন্টাপোলিশ), পাহাড়পুর, ওমপুর, ওদন্তপুর, বট গোহালি (বর্তমান গোয়াল ভিটা), সোমপুর, বিলাসপুর ও হরধাম জয়স্কন্ধবার, হরধাম, রামাবতী, বিজয়নগর, রাজমহল, কজঙ্গল, মুর্শিদাবাদ, পাণ্ডুয়া, তাণ্ডা, পাটনা।

২. পূর্ব ও দক্ষিণ বঙ্গ: গঙ্গাবন্দর, চন্দ্রকেতুগড় (গঙ্গানগর), বঙ্গনগর, গাঙ্গে, নব্যাকাশিকা, বারকমণ্ডল-বিষয়, সুবর্ণবীথি, চূড়ামনি-নৌযোগ, চন্দ্রবর্মনকোট (কোটালিপাড়া), সমতটনগর, পট্টিকেরা, ময়নামতী, দেবপর্বত, মেহারকুল, বিক্রমপুর, বজ্রযোগিনী, রামপাল, সুবর্ণগ্রাম (সোনারগাঁও), সৌনাগড়া, স্বর্ণগ্রাম, ওয়ারি বটেশ্বর।[৫০]

৩. পশ্চিমবঙ্গ: তাম্রলিপ্তি, নবদ্বীপ, পুষ্করণ, বর্ধমান, সোমপুর, সিংহপুর, প্রিয়ঙ্গু, কর্ণসুবর্ণ, চম্পা, বিজয়পুর, দণ্ডভুক্তি, ত্রিবেণী, সপ্তগ্রাম, ঔদুম্বর, কজঙ্গল, মুদগিরি, বিলাসপুর।

ধারণা করা হয়, রাজশক্তি তার আমলা ও সেনাবাহিনীর ভরণপোষণ এবং নিজের স্বার্থে উদ্বৃত্ত উৎপাদনের দিকে দৃষ্টি দেয়ার ফলে নগরগুলো গড়ে ওঠে। এ উদ্বৃত্তের একটা অংশ রাজা রাজস্বরূপে গ্রহণ করত, বাকি অংশ বেসামরিক নাগরিকদের প্রয়োজন মেটাত। কারিগরি শিল্পের বিকাশ, বাণিজ্যের প্রসার ও সম্প্রসারিত রাজশক্তির উদ্বৃত্ত ফলানোর প্রবল তাগিদ, এই তিনটি কারণ নগরায়নের পথ প্রশস্ত করে থাকতে পারে।[৫১]

সাধারণত যেসব নগর রাষ্ট্রীয় ও সামরিক প্রয়োজনে গড়ে ওঠে সেখানে রাষ্ট্রীয় ও সামরিক কর্মচারী ও চাকুরিজীবীরাই প্রধানত বসবাস করত। রাজা, মহারাজা, সামন্তরাও নগরবাসী ছিলেন। ধর্ম ও শিক্ষাগুরু, আচার্য, পুরোহিত, ছাত্র, শিষ্য এরাও ছিলেন নগরবাসী। শিল্প বাণিজ্যের সাথে সংশ্লিষ্ট শ্রেষ্ঠী, সার্থবাহ, কুলিক এবং তাদের দোকানপাট বাণিজ্যের দপ্তর সবই নগরে।

স্বর্ণকার, সুবর্ণবণিক, গন্ধবণিক, অট্টালিকাকার, কোটক, অন্যান্য ছোট বড় শিল্পী ও বণিকরা ছাড়াও বিভিন্ন প্রকার সেবার জন্য রজক, নাপিত, গোপ এরাও নগরে বাস করত। ম্লেচ্ছ ও অন্ত্যজ পর্যায়ের কিছু সমাজ সেবক যেমন: ডোম, চণ্ডাল, ডোলাবাহী, চর্মকার, মাংশচ্ছেদ ইত্যাদি - এদের নগরের বাইরের অংশে বসবাস করতে হতো। এসব সেবক ও শ্রমিকেরা নগরবাসী, কিন্তু এরা নাগরিক হিসেবে বিবেচিত হতো না।

শ্রেষ্ঠী, শিল্পী, বণিক, রাজকর্মচারী, রাষ্ট্রপ্রধান, সামন্ত, বিত্তবান এবং ব্রাহ্মণরাই প্রধানত নাগরিক অধিকার ভোগ করত। এসব নাগরিকরাই ছিল সামাজিক ধনের প্রধান বণ্টনকর্তা। নগরীগুলোকে তারা ঐশ্বর্য ও বিলাসাড়ম্বরের কেন্দ্ররূপে গড়ে তুলেছিল। বাৎসায়নের কামসূত্র এবং প্রাচীন কাব্য-সাহিত্যে নগরগুলির বর্ণনায় শ্রেণিবদ্ধ প্রাসাদ, নরনারীর প্রসাধন, অলংকার প্রাচুর্য, বারাঙ্গণা প্রসঙ্গ, বিলাসোপকরণ ও ঐশ্বর্যের বিস্তারিত বর্ণনা রয়েছে।

---

৫০ সাম্প্রতিক খননে নরসিংদি জেলায় ওয়ারি বটেশ্বর নগরীর ধ্বংসাবশেষ আবিস্কৃত হয়েছে।

৫১ দিলীপ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৮।

নগর প্রশাসনের জন্য নগরপাল বা পুরপাল, কোতোয়াল, পুরোপালোপরিক প্রভৃতি পদের ব্যক্তিবর্গ ছিল। রাজধানী, ভুক্তি, বিষয়, মণ্ডল, বীথি, অধিষ্ঠান এসব শাসনতান্ত্রিক অভিধা যুক্ত হতো নগরগুলির নামের সাথে। অধিষ্ঠানগুলো অধিকাংশ ক্ষেত্রেই রাজস্ব সংগ্রহ, স্থানীয় বিচার ব্যবস্থা, ভূমি ব্যবস্থা এবং শান্তিরক্ষা ব্যবস্থার নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্র হিসেবে পরিগণিত ছিল। এছাড়াও বাণিজ্যিক ও সরকারি বিভিন্ন অফিসও প্রতিষ্ঠিত হতো এ সব নগরে। তবে গ্রাম ও শহরের সম্পর্ক ছিল নিবিড়।[৫২]

বিশিষ্ট প্রত্নগবেষক সুফি মোস্তাফিজুর রহমান (২০০৭) তাঁর সম্পাদিত গ্রন্থে বাংলার নগরায়ন বোঝার জন্য উপমহাদেশের প্রধান প্রধান প্রাচীন নগর গুলোর প্রত্নতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য[৫৩] চিহ্নিত করেছেন এবং আদি ঐতিহাসিক যুগের বাংলার কয়েকটি শহরের বর্ণনা উপস্থাপন করেছেন। তাঁর মতে আদি-ঐতিহাসিক যুগে আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব ৬০০ থেকে ৩০০ খ্রিস্টাব্দ বাংলায় নগরায়ন ঘটে। এখানে উপমহাদেশের প্রধান প্রধান প্রাচীন নগরগুলোর প্রত্নতাত্ত্বিক চরিত্র সংক্ষিপ্ত আকারে বিবৃত করা হলো:

প্রাচীর:[৫৪] অধিকাংশ নগর ছিল মাটির তৈরি প্রাচীর দিয়ে ঘেরা, তবে মাটি ও ইট দিয়ে তৈরি প্রাচীরও দেখা যায়। দুর্গ-প্রাচীরের বাইরে পরিখা থাকত। পাটলীপুত্রে প্রাচীর ছিল দৈর্ঘ্যে ১৪.৪৮ কি.মি. এবং প্রস্থে ২.৪১ কি.মি.। কৌশাম্বী দুর্গের পরিধি ছিল ৬.৪৩ কি.মি. এবং প্রায় ২০ কি.মি.। এলাকাব্যাপী প্রাচীন বসতি ঢিবি দেখা যায়। পুরাতন রাজগৃহ নগরের দুর্গ-প্রাচীরের পরিধি ছিল ৭.২৩ কি.মি., নতুন রাজগৃহ নগরের দুর্গ-প্রাচীরের পরিধি ৪.৮২ কি.মি. এবং নাগার্জুনকুণ্ড দুর্গ-প্রাচীর ছিল ৯১৪.৪৬০৯.৬ বর্গ মি.। অধিকাংশ প্রাচীন নগরীতে দুর্গ থাকলেও দুর্গ-প্রাচীর ছাড়া নগরের দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়; যেমন, হস্তিনাপুর। কোনো কোনো ক্ষেত্রে দুটি দুর্গ-প্রাচীরও পাওয়া যায়; যেমন, রাজগিরি। দুর্গ-প্রাচীরে একাধিক পর্যবেক্ষণ-টাওয়ার ও প্রবেশপথ থাকত।

রাস্তা:[৫৫] আন্তঃযাতায়াতের জন্য রাস্তার ব্যবস্থা ছিল। শৈখান, বীর মাউণ্ড, সিরকাপ ও নাগার্জুনকুণ্ডে রাস্তা সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ উপাত্ত পাওয়া যেতে পারে। বীর মাউণ্ড আন্ত:রাস্তা-ব্যবস্থার একটি চমৎকার উদাহরণ। এখানে উৎখননের মাধ্যমে ৪টি রাস্তা এবং ৫টি লেন উন্মোচন করা হয়েছে। মূল রাস্তাটি ২২ ফুট চওড়া, অন্যান্য রাস্তাগুলোর প্রস্থ ৪ থেকে ১৭ ফুট। নাগার্জুনকুণ্ডতে একটি মূল-রাস্তা আবাসিক এলাকাকে বিভক্ত করেছে। ব্রহ্মপুরীতে বাড়ির দিকের মূল রাস্তা ২ ফুটের মতো।

ঘরবাড়ি ও দোকানপাট:[৫৬] কৌশাম্বী ও ভিটার বাড়িগুলো ২ প্রকার; বাণিজ্য উপলক্ষে রাস্তার সঙ্গে সংযুক্তি এবং আবাসিক। বীর মাউণ্ড, কৌশাম্বী, ভিটা, নাগার্জুনকুণ্ড প্রভৃতিতে রাস্তার পাশে দোকানের সাক্ষ্য পাওয়া যায়। শিশুপালগড়ে দুই কক্ষসহ একটি বারান্দাযুক্ত বাড়ি দেখা যায়। ঘরের মেঝে নির্মাণে উপাদানগত বৈচিত্র্য আছে, তবে ইটের বিছানা-সারির উপর কাদা এবং চুন-প্লাস্টারের ব্যবহার সাধারণ।

---

৫২ নীহার রঞ্জন রায়, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০৯।

৫৩ সুফি মোস্তাফিজুর রহমান সম্পাদিত (২০০৭) প্রত্নতাত্ত্বিক ঐতিহ্য (বাংলাদেশ সাংস্কৃতিক সমীমালা-১), বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ঢাকা, পৃ. ৪৯৫-৫০৫, ৫০৯-৫১১।

৫৪ মোস্তাফিজুর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৯৫।

৫৫ ঐ।

৫৫ ঐ।

৫৬ ঐ।

পয়ঃপ্রণালি:[৫৭] বীর মাউণ্ডের রাস্তা-৪ এবং লেন-১ এ লাইমস্টোন এবং Kanjur নির্মিত Surface drain দেখা যায়, যা একই সঙ্গে slate-Gi slab দ্বারা সারিবদ্ধ ছিল। ঘর-বাড়িসমূহের পর্যাপ্ত স্বতন্ত্র নিষ্কাশন-প্রণালি ছিল। মূলত পোড়ামাটির বলয় নির্মিত বর্জ্য-শোষক ব্যবহৃত হতো। খ্রিস্টপূর্ব ৫ শতক থেকে ১ খিস্টাব্দের মধ্যবর্তী সময়ে এটি উপমহাদেশের সংস্কৃতির অন্যতম প্রদান বৈশিষ্ট্য ছিল।

কারিগর-শ্রেণি ও শিল্পকলা: প্রশাসক, ধর্মযাজক, বণিক প্রভৃতি অভিজাত-শ্রেণির ব্যবহার এবং ধর্মীয় ও ব্যবসা বাণিজ্যের কারণে প্রায় সমস্ত নগরে উন্নতমানের শিল্প-বস্তু, যেমন, মৃৎপাত্র (রোলেটেড মৃৎপাত্র, উত্তরাঞ্চলীয় কালো মসৃণ মৃৎপাত্র, কালো প্রলেপযুক্ত মৃৎপাত্র, নবযুক্ত মৃৎপাত্র, স্ট্যামপড মৃৎপাত্র প্রভৃতি), স্বল্প-মূল্যবান পাথর ও কাঁচের পুঁতি, পোড়ামাটির ফলক, ধাতব অলংকার, প্রসাধন-বস্তু (আয়না, সুরমা কাঠি), বাটখারা, সিল মোহর, ধাতব মুদ্রা, শিল-নোড়া, কূপ, ধর্মীয় নিদর্শন প্রভৃতি তৈরি হতো। উপমহাদেশের প্রায় সমস্ত নগরের ধ্বংস-স্তূপে এ ধরনের প্রত্ন-বস্তু আবিস্কৃত হয়।[৫৮]

নাগরিক সুযোগ সুবিধা: বীর মাউণ্ডে কিছু নাগরিক বৈশিষ্ট্য দেখা যায়। ময়লা-আবর্জনা ফেলার জন্য রাস্তা এবং স্কয়ারগুলোয় গোলাকার ময়লার পাত্র স্থাপন করা হয়েছিল। সম্ভবত ঘর-বাড়ির কর্নারগুলোকে রথ কিংবা গাড়ির আঘাত থেকে রক্ষার জন্য এক ধরনের অমসৃণ পাথর-স্তম্ভ দেখা যায় যা প্রায় মাটি থেকে ৩ ফুট উঁচু। নগরে থাকত পরিকল্পিত ঘরবাড়ি, রাস্তা এবং পয়ঃপ্রণালি। বর্জ্য শোষকে ময়লা ফেলা হতো। পয়:প্রণালিতে পোড়ামাটির বলয় ব্যবহার করা হতো।[৫৯]

সামাজিক শ্রেণি-বিভাগ: শৈখান ও সিরকাপে স্বতন্ত্র শ্রেণি-ব্যবস্থা ছিল। বসতি-প্রকল্প থেকে দেখা যায় যে, প্রায় সমস্ত নগর এলাকাতে কতগুলো ব্লকের অস্তিত্ব ছিল।

লিখন-ব্যবস্থা: খ্রিস্টপূর্ব ৩ শতক থেকে আদি-ঐতিহাসিক উপমহাদেশে লিখন-ব্যবস্থা সম্পর্কে প্রত্নতাত্ত্বিক উপাত্ত স্পষ্ট হতে শুরু করে এবং ধারণা করা হয় যে, এর প্রাচীনত্ব আরো কয়েক শতক এগিয়ে যেতে পারে। Early historic Indian Urban growth phase-ও (খ্রিস্টপূর্ব ৭-৬ষ্ঠ শতক) তাত্ত্বিকভাবেও সঠিক। খ্রিস্টপূর্ব ৩য় শতক থেকে আর্থ-সামাজিক রাজনৈতিক বিষয়াদি : extuat data-র context স্পষ্ট।[৬০]

আদি-ঐতিহাসিক যুগে বাংলায় নগরায়ন: বাংলার চারটি প্রধান ভৌগোলিক অঞ্চলেই আদি-ঐতিহাসিক যাগে নগর বিকাশ লাভ করেছিল - বরেন্দ্র অঞ্চলে মহাস্থানগড় ও বানগড়, মধুপুর অঞ্চলে উয়ারী-বটেশ্বর, রাঢ় অঞ্চলে মঙ্গলকোট, কোটাসুর ও পোখান্না এবং নিম্ন-ব-দ্বীপ অঞ্চলে চন্দ্রকেতুগড় ও তাম্রলিপ্তিতে (মানচিত্র-১)।[৬১]

---

[৫৭] মোস্তাফিজুর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৯৬।
[৫৮] ঐ।
[৫৯] ঐ।
[৬০] ঐ।
[৬১] ঐ।

বানগড়: বানগড় পশ্চিমবঙ্গের পশ্চিম দিনাজপুর জেলায় বরেন্দ্রভূমিতে অবস্থিত। বানগড়ের প্রাচীন নাম কোটি বর্ষ, দেবকোট, বনপুর, সুনিতপুর প্রভৃতি। বায়ু পুরাণ ও ভরত সংহিতা (ছয় শতক) গ্রন্থে কোটি বর্ষকে নগর বলা হয়েছে। গুপ্ত-লিপিতে কোটি বর্ষকে পুণ্ড্রবর্ধন ভুক্তির জেলা (বিষয়) এবং জেলা শহর (অধস্তন) বলা হয়েছে। পালদের সময় কোটি বর্ষকে বিষয়ের মর্যাদা ভোগ করতে দেখা যায়। সন্ধ্যাকর নন্দীর (১১ শতক) রাম চরিত কাব্য গ্রন্থে সুনিতপুরকে (বানগর) সমৃদ্ধ ও জাঁকজমকপূর্ণ শহর অভিধায় ভূষিত করা হয়েছে। ১৩ শতকের গোড়ার দিকে বখতিয়ার খলজি দেবকোট (বানগড়) দখল করে তার প্রশাসনিক কেন্দ্র গড়ে তোলেন।

প্রত্নতাত্ত্বিক অনুসন্ধানে দেখা যায়, বানগড় প্রত্নস্থানটি একটি দুর্গ-নগরী। দুর্গের আয়তন ১৮০০X১৫০০ বর্গফুট। পুনর্ভবা নদীর তীরে অবস্থিত বানগড় দুর্গের তিনদিকে পরিখা দৃষ্টিগোচর হয়। তথ্য-অপ্রতুলতার জন্য প্রাচীর বেষ্টিত দুর্গ ছাড়া বানগড় প্রত্নস্থানের অন্যান্য বসতি সম্পর্কে কিছু জানা যায় না।

প্রত্ন-বস্তুর আলোকে কে.জি. গোস্বামী সমৃদ্ধ বাণিজ্যিক অবস্থার কথা বলেছেন। ১৮ শুঙ্গ কুষাণ যুগে বানগড়ের সমৃদ্ধি লক্ষ করা গেলেও শুঙ্গ ও গুপ্ত-যুগের শেষে বানগড়ের অবনতি বা অবক্ষয়ের চিহ্ন পরিলক্ষিত হয়। তবে পাল যুগের উঁচু উঁচু প্রাচীর, নর্দমা, কূপ সবই বানগড়ের সমৃদ্ধির পরিচায়ক। উৎখননে শুঙ্গ-কুষাণ স্তরে পাওয়া গিয়েছে তামা ও লোহার তৈরি সরঞ্জাম, হাতির দাঁতের সুচ, স্বল্প-মূল্যবান পাথর (কার্নেলিয়ান, অ্যাগেট, কোয়ার্টজ, চ্যালসেডনি, অ্যমেথিস্ট, জেসপার, জেড), কাঁচ ও পোড়ামাটির পুঁতি, কাঁচ ও পোড়ামাটির অলংকার, পোড়ামাটির গণেশ-মূর্তি, খেলনা, তৈজসপত্র প্রভৃতি। আরও আবিষ্কৃত হয়েছে সোনা ও তামার মন্ত্রপূত কবচ, তামার এন্টিমনি রড, লোহার বর্শা, ছুরি, তরবারি, পোড়ামাটির নিক্ষেপাস্ত্র, ছাপাঙ্কিত রৌপ্যমুদ্রা ও ছাঁচেঢালা তামার মুদ্রা। ব্রাহ্মী অক্ষরে (প্রাকৃত ভাষা) লেখা মাটির সিল প্রত্ন-নিদর্শন থেকে প্রমাণিত হয় যে বানগড় অঞ্চলে খ্রিস্টপূর্ব ২ শতকে লেখার প্রচলন ছিল।[৬২]

মহাস্থানগড়: মহাস্থানগড়ের প্রাচীন নাম পুণ্ড্রনগর। স্যার আলেকজান্ডার কানিংহাম ১৮৭৯ সালে চীনা পরিব্রাজক হিউয়েন সাং -এর বর্ণনানুসারে মহাস্থানকে পুণ্ড্রনগর বলে শনাক্ত করেন। ১৯৩০ সালে আবিষ্কৃত ব্রাহ্মী অক্ষরে বাংলার প্রাচীনতম শিলালিপি থেকে প্রমাণিত হয় যে মহাস্থানগড়ই ছিল প্রাচীন পুণ্ড্রনগর। প্রাচীন লিপির সারমর্ম হলো - পুণ্ড্রনগর এলাকায় দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েছে তাই কেন্দ্রীয় সরকার প্রাদেশিক সরকারকে আদেশ দিয়েছে স্থানীয় জনগণকে শস্য এবং অর্থ দিয়ে সাহায্য করতে। লিপিতে উল্লেখ ছিল সুদিন ফিরে এলে প্রজারা আবার রাষ্ট্রীয় কোষাগারে শস্য ও অর্থ ফেরত দেবে। পুণ্ড্রনগর ছিল পুণ্ড বর্ধনের রাজধানী। প্রাচীন পুণ্ড্র/পুণ্ড বর্ধনের নাম বিভিন্ন প্রাচীন মহাকাব্য, ধর্মগ্রন্থ, লিপি ও সাহিত্যে উল্লেখ আছে। প্রত্নতাত্ত্বিক অনুসন্ধান ও খননের প্রকাশিত প্রতিবেদনের অভাবে পুণ্ড্রনগর সম্পর্কে বিস্তারিত জানার অবকাশ ছিল অল্প।

দুর্গ-নগরী পুণ্ড্র ছিল প্রাচীর বেষ্টিত। চারদিক ছিল পরিখা, বিল ও করতোয়া নদী। প্রায় আয়তাকার দুর্গ-নগরী উত্তর দক্ষিণে ১৫২৩ মি. এবং পূর্ব-পশ্চিমে ১৩৭১ মি.। প্রাচীন নগরীর ২০৮ হেক্টর জমিতে বর্তমান বসতি গড়ে উঠলেও প্রাচীনকালের বসতি-চিহ্ন পাওয়া

---

[৬২] মোস্তাফিজুর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৯৮।

যায় প্রায় সর্বত্র। দুর্গ-নগরীর বাইরের তিন দিকে (অন্যদিকে করতোয়া নদী) ১৩২টি প্রত্নতাত্ত্বিক ঢিবি আবিষ্কৃত হয়েছে। দুর্গের বাইরে ১৩২টি প্রত্নস্থানের মধ্যে ১৪টি আদি-ঐতিহাসিক যুগের (৯টিতে উত্তরাঞ্চলীয় কালো মসৃণ মৃৎপাত্র পাওয়া গিয়েছে), ৮০টি প্রাক-মধ্যযুগের এবং তথ্যের অপ্রতুলতার কারণে ৩১টি প্রত্নস্থানের সময় সম্পর্কে কোনো ধারণা পাওয়া যায়নি। দুর্গের ভেতরে আদি-ঐতিহাসিক যুগ থেকে শুরু করে প্রাক-মধ্যযুগ পর্যন্ত বিকশিত মানব বসতির চিহ্ন পাওয়া যায়। তবে কিছু কিছু মানব বসতির চিহ্ন মধ্যযুগের। প্রাচীন ব্রাহ্মীলিপির উপর ভিত্তি করে রহমান অভিমত প্রদান করেন যে, মহাস্থানের বয়স খ্রিস্টপূর্ব ৪০০ অব্দ। ফ্রান্স-বাংলাদেশ কার্বন-১৪ ভিত্তিতে মহাস্থানের সাংস্কৃতিক স্তরের বয়স নির্ধারণ করেন খ্রিস্টপূর্ব ৩৭১ অব্দ। ফ্রান্সের উৎখনন দলনেতা স্যালের মতে মহাস্থান নগরটি বিকশিত হয়েছিল মৌর্যযুগে। রাজনৈতিক ও ব্যবসায়িক কারণে নগরটির জন্ম হয়েছিল। কিন্তু দিলীপ কুমার চক্রবর্তী এ প্রসঙ্গে দ্বিমত প্রকাশ করে বলেন, মৌর্যযুগের অনেক আগে এখানে মানব-বসতি শুরু হয়েছিল। তারই ধারাবাহিকতায় এখানে নগরায়ন শুরু হয়। সম্প্রতি মহাস্থানের অদূরে উয়ারী-বটেশ্বরে কৃষ্ণ এবং রক্তিম মৃৎপাত্র আবিষ্কৃত হওয়ায় চক্রবর্তীর অনুমান সত্য প্রমাণিত হয়। করতোয়া, নাগর, কোকাই গঙ্গা, গাঙ্গানাই ও ভাদই নদীর তীরে বা একটু দূরে (০.৫-১.২৫ কি.মি.) ৪৪টি বসতি গড়ে ওঠে। ৩২টি বসতি বিলের পাড়ে এবং ৪০টি বসতি পুকুর পাড়ে গড়ে উঠেছিল। অল্প কিছু বসতি নদী, বিল বা পুকুর থেকে একটু দূরে ছিল। সেখানে তিন প্রকার বসতি-বিন্যাস পরিলক্ষিত হয়। মহাস্থান দুর্গকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছিল ৭৬টি বসতি। একই রকম বসতি-বিন্যাস পরিলক্ষিত হয় বানগড়, শিশুপালগড় ও কোশাম্বী দুর্গ-নগরীতে। ব্রজদুলাল চট্টোপাধ্যায়ের মতে বাংলার বসতিগুলো মূলত 'complex of sites' এবং এটি একটি আদর্শ নগর ব্যবস্থা। মহাস্থান দুর্গটি ছিল পুণ্ড্র নগরের কেন্দ্রীয় অবস্থান এবং পার্শ্বস্থ বসতিগুলো ছিল নগর সহযোগীদের জন্য গুচ্ছ-বসতি। সম্ভবত সেনা-সদস্য, কামার, কুমার, অন্যান্য কারিগর, বণিক, প্রশাসনিক কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বসতি।

বাংলাদেশ-ফ্রান্স উৎখনন খুবই সীমিত জায়গায় হলেও (১:৭৫০) তাতে তাৎপর্যপূর্ণ প্রত্নতাত্ত্বিক তথ্য আবিষ্কৃত হয়েছে। খ্রিস্টপূর্ব ৪ শতকের শেষ বা খ্রিস্টপূর্ব ৩ শতকের শুরুর সাংস্কৃতিক স্তরে পাওয়া গিয়েছে উত্তরাঞ্চলীয় কালো মসৃণ মৃৎপাত্র ও মাটির স্থাপত্য। এ সময়ে স্থাপত্যে কাঠের ব্যবহার ও রোলেটেড মৃৎপাত্রও পাওয়া যায়। খ্রিস্টপূর্ব ৩ শতকে মাটির প্রাচীর ও ছাদে টালির ব্যবহার লক্ষ করা যায়। এর আগে উত্তরাঞ্চলীয় কালো মসৃণ মৃৎপাত্রের সঙ্গে যোগ হয় মৌর্য-বৈশিষ্ট্যযুক্ত পোড়ামাটির ফলক ও প্রাণী, স্বল্প-মূল্যবান পাথর ও কাঁচের পুঁতি, এমনকি পোড়ামাটির কূপ। খ্রিস্টপূর্ব ৩ শতক বা খ্রিস্টপূর্ব ২ শতকের শুরুতে উপর্যুক্ত প্রত্ন-বস্তুর সঙ্গে যোগ হয় তামার পাত্র, ছাঁচে ঢালা মুদ্রা, অলংকারের ছাঁচ, পাখি-আকৃতির লকেট ও স্বর্ণ। মাটির স্থাপত্য চালু থাকলেও টালির আকার বড় হয়ে ওঠে। কাঠের চিহ্নও পাওয়া যায়। এ সময়ে মেঝেতে মাটির বদলে ইট (ইটের টুকরা) ব্যবহৃত হতে থাকে। প্রত্ন-বস্তুর তালিকায় যোগ হয় ব্রোঞ্জের প্রদীপ ও আয়না, পাথরের হাতিয়ার ও তামার শিক (এন্টিমনি রড)। খ্রিস্টপূর্ব ২ শতকের স্তরে উপর্যুক্ত প্রত্ন-বস্তু পাওয়া গেলেও পরবর্তী সাংস্কৃতিক স্তরে (খ্রিস্টপূর্ব বা ১ শতকে) মাটির স্থাপত্যের বিভাজন-দেয়ালে পোড়ানো ইট এবং মেঝেতে ইটের গুড়া পাওয়া যায়। প্রত্ন-বস্তুর মধ্যে আরো যোগ হয় ব্রোঞ্জের কর্ণালঙ্কার ও স্বর্ণের লকেট। এই সময়েই নগর-প্রাচীর তৈরি শুরু হয়। খ্রিস্টপূর্ব ১ শতক বা খ্রিস্টীয় ১ শতকের প্রথমার্ধে পূর্ণাঙ্গ ইটের নতুন নগর-প্রাচীর পাওয়া যায়। এই স্তরে একটি গুরুত্বপূর্ণ

আবিস্কার হলো ছাপাঙ্কিত রৌপ্যমুদ্রার একটি ভাণ্ডার। ৯২টি ছাপাঙ্কিত রৌপ্যমুদ্রা সাম্রাজ্যিক/রাজকীয় সিরিজের। উৎখনন রিপোর্টে খ্রিস্টীয় শতকের সাংস্কৃতিক স্তরে প্রচুর প্রত্ন-বস্তু পাওয়া যায়। এমনকি খ্রিস্টীয় ১৮ শতক পর্যন্ত উৎখনন স্থানে মানব-বসতির চিহ্ন পাওয়া যায়। এ থেকে মনে হয় আদি-ঐতিহাসিক যুগে মহাস্থানে নগর গড়ে উঠেছিল।[৬৩]

চন্দ্রকেতুগড়: পশ্চিমবঙ্গের চব্বিশ পরগনার ভাগীরথীর উপনদী বিদ্যাধরী ও পদ্মার নবীন পলিমাটি গঠিত অঞ্চলে চন্দ্রকেতুগড় অবস্থিত। দেবালয়, হাদিপুর, শানপুকুর, বিনকরা প্রভৃতি গ্রাম নিয়ে প্রায় দুই বর্গমাইল এলাকা জুড়ে চন্দ্রকেতুগড় প্রত্ন ক্ষেত্রটির অবস্থান। এলাকাটি বিশাল কাদামাটির আয়তাকার প্রাচীর বেষ্টিত। চন্দ্রকেতুগড় বাংলার ইতিহাসে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। খ্রিস্টপূর্ব কালে গড়ে ওঠা চন্দ্রকেতুগড়ে প্রাপ্ত বাংলার সর্বশ্রেষ্ঠ পোড়ামাটির ফলকগুলো থেকে নগর জীবনের নান্দনিক দিক সম্পর্কে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ধারণা পাওয়া যায়। প্রাক-গুপ্তযুগ স্তরে চন্দ্রকেতুগড়ে কাঠ ও বাঁশের তৈরি ঘর, ইটের বাড়ি, টালির ছাদ ও কাদামাটির ভিতের উপর মাটির দেয়ালের নিদর্শন পাওয়া গিয়েছে। চন্দ্রকেতুগড়ে বসবাসের স্থান ও ধর্মীয় এলাকা পৃথক ছিল। খনা মিহিরের ঢিবিতে উন্মোচিত হয়েছে প্রকাণ্ড একটি ইটের মন্দির ও ছোট-খাটো মন্দিরাকৃতি কাঠামোর অবশেষ। গুপ্ত-যুগে চন্দ্রকেতুগড়ে ইটের তৈরি মন্দির ও বাড়িঘরের প্রাধান্য ছিল।

প্রাক মৌর্য যুগ থেকে গুপ্ত যুগ পর্যন্ত বিভিন্ন স্তরে প্রাপ্ত মাটির আস্তরণ দেওয়া কঞ্চির বেড়া, টালির ছাদ, কাদামাটির মেঝে, শস্যাগার, ইঁদারা, মৃৎপাত্র (রোলেটেড মৃৎপাত্র, উত্তরাঞ্চলীয় কালো মসৃণ মৃৎপাত্র প্রভৃতি), তামার পাত্র, পোড়ামাটির ভাস্কর্য, হাতির দাঁত ও হাড়ের তৈরি সুচ, স্বল্প-মূল্যবান পাথরের পুঁতি (কোয়ার্টজ, অ্যাগেট, জেসপার, কারনেলিয়ান, চ্যালসেডনি প্রভৃতি) ও কাঁচের পুঁতি প্রভৃতি নগরায়নের চিহ্নবহ। চন্দ্রকেতুগড় হতে পারে পেরিপ্লাস ও টলেমি বর্ণিত প্রাচীন বন্দর গাঙ্গে। এটি ছিল একটি শিল্প সমৃদ্ধ নদীবন্দর। চন্দ্রকেতুগড়ের সঙ্গে দক্ষিণ এশিয়া ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার অন্যান্য বন্দরের, এমনকি ভূ-মধ্যসাগর অঞ্চলেরও যোগাযোগ ছিল। উল্লেখ্য, এখানকার স্বল্প-সংখ্যক ঢিবিতে সীমিত প্রত্নতাত্ত্বিক খনন হয়েছে, ভবিষ্যতে পর্যাপ্ত উৎখনন হলে চন্দ্রকেতুগড়ের নগরায়ন সম্পর্কে অনেক নতুন তথ্য জানা যেতে পারে।

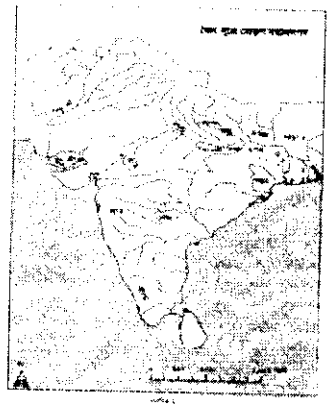

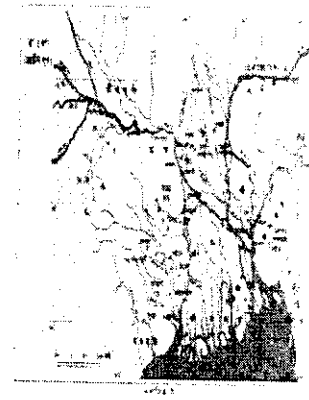

[৬৩] সুফি মোস্তাফিজুর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫০১।

তাম্রলিপ্তি: তাম্রলিপ্তি বা তমলুক পশ্চিমবঙ্গের চব্বিশ পরগনা জেলার রূপনারায়ণ নদীর তীরে অবস্থিত। তাম্রলিপ্তিতে কোনো প্রাচীর পাওয়া যায়নি। নব্যপ্রস্তর ও তাম্র-প্রস্তর যুগে তাম্রলিপ্তিতে মানব-বসতি ছিল। দেশীয়, গ্রিক ও চীনা পরিব্রাজকদের লেখায় বাণিজ্য ও ভ্রমণের জন্য তাম্রলিপ্তি থেকে সমুদ্রযাত্রার বর্ণনা পাওয়া যায়। টলেমির ভ্রমণ-বৃত্তান্তে তাম্রলিপ্তিকে বলা হয়েছে তামালাইটস। তাম্রলিপ্তির ইতিহাস নৌ-বাণিজ্যের ইতিহাস। গাঙ্গেয় সমভূমির একাধিক নগরের সঙ্গে সুদীর্ঘ আদান-প্রদানের ফসল তাম্রলিপ্তির নগর-সভ্যতা।

তবে তাম্রলিপ্তিতে নগরায়ন-প্রক্রিয়া শুরু হয় আদি-ঐতিহাসিক পর্বে। খ্রিস্টপূর্ব ৩০০ শতক থেকে ৭০০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত অর্থাৎ প্রায় এক হাজার বছর তাম্রলিপ্তির পরিচয় ছিল প্রধানত একটি বন্দর হিসেবে। তাম্রলিপ্তিতে সীমিত উৎখননে পোড়া ইটের ঘরবাড়ি, মৃৎপাত্র, পোড়ামাটির শিল্পকর্ম ও সিলমোহর আবিস্কৃত হয়েছে, পাওয়া গিয়েছে খরোষ্ঠি ও ব্রাহ্মীতে লেখার নিদর্শন।[৬৪]

কোটাসুর, পোখান্না, দিহার ও মঙ্গলকোট: পশ্চিমবঙ্গের রাঢ় জনপদের বর্তমান বীরভূম জেলার ময়ূরাক্ষী নদীর তীরে কোটাসুর, বাঁকুড়ার দামোদর নদীর তীরে পোখান্না ও বর্ধমানের কুনুর ও অজয় নদীর সংগমস্থলে মঙ্গলকোটে নগর-সভ্যতা বিকশিত হয়েছিল। নব্যপ্রস্তর, তাম্র-প্রস্তর যুগে রাঢ় ছিল বাংলার প্রাণ-কেন্দ্র। এই এলাকায় বাংলার প্রাচীনতম কৃষিজীবী সম্প্রদায়ের সন্ধান পাওয়া যায়। স্থানীয় সম্পদের সদ্ব্যবহার করে আদি-ঐতিহাসিক যুগে এখানে নগরায়ন ঘটে। পশ্চিমবঙ্গে আদি-ঐতিহাসিক যুগের নগরায়নের চিত্র ভালভাবে বোঝা যায় মঙ্গলকোট প্রত্নস্থান থেকে। বিক্রমাদিত্যের ঢিবি, কাছারি ভাঙ্গা ও সরকারি ডাঙ্গা নামে তিনটি প্রধান ঢিবি ও তৎসংলগ্ন এলাকা ছিল জন-বসতির কেন্দ্র। বিক্রমাদিত্যের ঢিবি প্রায় দুই কিলোমিটার বিস্তৃত। মঙ্গলকোট নগরের বহিঃপ্রাচীর এখনো টিকে আছে। তবে প্রত্নতাত্ত্বিক খননে এ পর্যন্ত মঙ্গলকোটে ৬টি সাংস্কৃতিক স্তর পাওয়া গিয়েছে। সুনির্দিষ্টভাবে চিহ্নিত করা না গেলেও অনুমান করা হয় মৌর্য-শুঙ্গ-কুষাণ যুগে মঙ্গলকোটে নগরায়ন শুরু হয়। খ্রিস্টীয় এক শতক থেকে তিন শতকের শেষ-পাদ পর্যন্ত বিস্তৃত পঞ্চম সাংস্কৃতিক স্তরটিই নগরায়নের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পর্ব। মঙ্গলকোটের নগরায়ন সাংস্কৃতিক স্তরে প্রাপ্ত উল্লেখযোগ্য প্রত্ন-নিদর্শন হলো লোহার তৈরি তীরের ফলা, বাটালি, ছুঁচের অগ্রভাগ, লোহার আকরিক থেকে ধাতু গলানোর নিদর্শন, তামার তৈরি আংটি, বালা, কবচ, লকেট, সুরমাকাঠি, স্বল্প-মূল্যবান পাথর ও কাঁচের পুঁতি, হাড়ের চিরুনি, পোড়ামাটির ভাস্কর্য, ইট, গাত্রমার্জনী বা গা ঘষার ঝামা, খেলনা, জালা ও চাকা, বাড়ি-সংযুক্ত কূপ, চনি-সুরকির মেঝে, আট বাঁধানো উঠোন, ইটের তৈরি জল-নিষ্কাশনী নালা, পাথরের নোড়া, সিলমোহর, নৃত্যরত নারী, সূক্ষ্ম-বস্ত্র-পরিহিত নারী, ছাঁচে ঢালা মুদ্রা, পুঁতি তৈরির কারখানা প্রভৃতি।

দ্বারকেশ্বর নদীর তীরে অবস্থিত আধুনিক বিষ্ণুপুরের দিহারও আদি-ঐতিহাসিক যুগে একটি নগর ছিল। ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার পর এখনো ১৫-২০ একর জায়গা নিয়ে দিহার ঢিবিটি দাঁড়িয়ে আছে। আদি-ঐতিহাসিক যুগের প্রত্ন-বস্তুর সঙ্গে এখানে আবিস্কৃত হয়েছে ছাঁচে ঢালা মুদ্রা।[৬৫]

---

৬৪ সুফি মোস্তাফিজুর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫০২।

৬৫ ঐ, পৃ. ৫০৩।

উয়ারী-বটেশ্বর: উয়ারী-বটেশ্বর নরসিংদী জেলায় অবস্থিত বাংলাদেশের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রত্নস্থল। উয়ারী ও বটেশ্বর লাগোয়া গ্রাম দুটি বেলাবো থানা সদর থেকে প্রায় ৪ কি.মি. দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত। উয়ারী-বটেশ্বর অঞ্চল থেকে পাওয়া গেছে নব্য প্রস্তর যুগের হাতিয়ার, স্বল্প-মূল্যবান পাথরের পুঁতি, কাচ ও পোড়ামাটির পুঁতি, ছাপাঙ্কিত রৌপ্যমুদ্রা, লোহার তৈরি প্রত্ন-বস্তু, মৃৎপাত্র, পোড়ামাটির শিল্পকর্ম, শিলনোড়া, ব্রোঞ্জ ও তামার তৈরি প্রত্ন-বস্তু প্রভৃতি। উয়ারী-বটেশ্বরে সাম্প্রতিক উৎখননে প্রায় ২ মি. গভীর সাংস্কৃতিক স্তর উন্মোচিত হয়েছে, যেখানে উত্তরাঞ্চলীয় কালো মসৃণ মৃৎপাত্র, রোলেটেড মৃৎপাত্র, নবযুক্ত মৃৎপাত্র, লোহার তৈরি প্রত্ন-বস্তু, স্বল্প মূল্য পাথরের পুঁতি, পাথর (পুতি তৈরি কাঁচামাল), পাথরের ফ্লেক, চিপস (পুতি তৈরিরর উপজাত), অসমাপ্ত পাথরের পুতি এবং কাচের পুতি, ইটের স্থাপনা, চুনি-সুরকিতে নির্মিত ঘরের মেঝে, রাস্তা (১৬০ মি. দৈর্ঘ্য ও ৫ মি. প্রশস্ত এবং ২ মি. প্রশস্ত ২০ মি. দৈর্ঘ্য বাইলেন), পোড়ামাটির নিক্ষেপাস্ত্র প্রভৃতি আবিস্কৃত হয়েছে। ইতোমধ্যে উয়ারী-বটেশ্বরের মানব বসতিকে খ্রিস্টপূর্ব পাঁচ শতক (কার্বন-১৪ পরীক্ষার মাধ্যমে) বলে নির্ধারণ করা হয়েছে। উল্লেখ্য, উয়ারী-বটেশ্বরে প্রাপ্ত জনপদ সিরিজের ছাপাঙ্কিত রৌপ্যমুদ্রা প্রমাণ করে যে, এটি একটি জনপদ বা জনপদের অংশ (খ্রিস্টপূর্ব ষোড়শ মহাজনপদ সিরিজের) ছিল যার নাম আমরা এখনো জানি না। এখানে জনপদ স্থাপনের পূর্বের তাম্র-প্রস্তর সংস্কৃতির নিদর্শন কৃষ্ণ এবং রক্তিম মৃৎপাত্র ও গর্ত বসতি আবিস্কৃত হয়েছে।[৬৬]

উয়ারী-বটেশ্বর ছিল নদীবন্দর, বাণিজ্যকেন্দ্র ও স্বল্প মূল্যবান পাথরের পুতি উৎপাদন কেন্দ্র। এটি মৌর্য সাম্রাজ্যের পূর্ব-সীমা হিসাবে উল্লিখিত হয়েছে। উয়ারী বটেশ্বর টলেমি বর্ণিত বাণিজ্য কেন্দ্র সৌনাগড়া। উয়ারী বটেশ্বরের সঙ্গে উপমহাদেশের অন্যান্য বন্দর দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া ও ভূ-মধ্যসাগরীয় অঞ্চলের বাণিজ্যিক যোগাযোগ ছিল।

উয়ারী-বটেশ্বর এলাকায় নগরায়নের পটভূমি:

১) উয়ারী-বটেশ্বর অঞ্চলের প্রত্নস্থানসমূহ মধুপুরগড়ে চালা অংশে শনাক্ত করা হলেও এগুলো নদী ও বিলের নিকটবর্তী। মৌসুমি বন্যা মধুপুরগড় অঞ্চলে প্রবেশ করলেও চালা অংশে, যেখানে মানুষের বসতি অবস্থিত, প্রবেশ করতে পারে না। নিচু সমতল ভূমি ও বাইদে বন্যা সীমাবদ্ধ থাকে। ভূমিরূপের কারণে নদী ও বিলের তীরে রৈখিক (লিনিয়ার) বসতি-বিন্যাস দেখা যায়। অনেকটা একই ধরনের বসতি-বিন্যাস মহাস্থান গড়ে দেখা যায়। মাখন লাল ভারতের উত্তর প্রদেশের গঙ্গা-যমুনা দোয়াব অঞ্চলে উচু ভূমিত নদী এবং বিপুল প্লাবন ভূমির পটভূমিতে একই ধরনের বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন বসতির কথা উল্লেখ করেছেন।

২) সম্ভবত প্রাচীন বসতি স্থাপনকারীরা নিকটবর্তী প্লাবন ভূমিকে চাষাবাদের কাজে ব্যবহার করত। মহাস্থানগড়ে গবেষণায় দেখা গেছে প্লেইস্টোসিন ভূমির ল্যাটারাইট স্তরের উপর পরিমাটি জমা হয়েছে। এই পলল মাটি কৃষি কাজের জন্য খুব উপকারী। এ অঞ্চলের সেচ ও গৃহস্থালি কাজ কর্ম ও ব্যবসা-বাণিজ্যে নদী গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। মধ্যপ্রাচ্যে (মিশর?) উৎপাদিত স্যান্ডউইচ কাচের পুঁতি, আরিকামেদুতে অথবা মান্টাইতে উৎপন্ন ভারত প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের এক

[৬৬] সুফি মোস্তাফিজুর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫০৩।

বর্ণিল টানা কাচের পুতি, থাইল্যান্ডের হাই টিন ব্রোঞ্জ, নবযুক্ত পাত্র ভূ-মধ্যসাগরীয় অঞ্চলের রোলেটেড মৃৎপাত্রসহ নানা স্বল্প মূল্যবান পাথরের পুতি/কাঁচামাল বিভিন্ন অঞ্চল থেকে উয়ারী-বটেশ্বরে এসেছিল। তাই বলা যায় - কৃষিকাজ, ব্যবসা-বাণিজ্য এ অঞ্চলের অর্থনীতিকে সমৃদ্ধ করেছিল।

৩) কৃষিকাজের পাশাপাশি নদী ও বিলের জলজ সম্পদ তাদের জীবন যাপন প্রণালিকে প্রভাবিত করেছিল। প্রত্নস্থল থেকে বেশ কিছু মাছ ধরা জালের কাঠি পাওয়া গেছে, যা মাছ ধরার কাজে ব্যবহৃত হতো বলে ধারণা করা হয়। প্রাণিজ সম্পদ আহরণের সুস্পষ্ট উপাত্ত পাওয়া না গেলেও স্থায়ী বসতি, কৃষিভূমি ও বন-জঙ্গলের ভিত্তিতে ধারণা করা যায় যে, এ অঞ্চলে প্রাচীনকালে গৃহপালিত এবং বন্য উভয় প্রকার প্রাণী সম্পদ ছিল।

৪) মধুপুর মাটি ঘরবাড়ি তৈরির জন্য খুবই উপযোগী যা প্রাচীন বসতি স্থাপনকারীরা ব্যবহার করেছিল। এই মাটি ব্যবহার করে এখনো ঘরবাড়ি তৈরি করা হয়। জাতি তাত্ত্বিক গবেষণায় দেখা যায় যে, এ অঞ্চলে প্রায় ৯০% ঘরের দেয়াল মধুপুর মাটি দিয়ে তৈরি। উয়ারী দুর্গ-নগরীতে উৎখননে উত্তরাঞ্চলীয় কালো মসৃণ মৃৎপাত্র পর্যায়ে মাটির দেয়ালের চিহ্ন পাওয়া গেছে। ঘরবাড়ির কাঁচামালের সুলভতা উয়ারী-বটেশ্বরে প্রাচীন মানুষের বসতি গড়ে ওঠায় সহায়ক ভূমিকা পালন করেছিল। বাংলাদেশের আরেকটি আদি-ঐতিহাসিক সময়ের প্রত্নস্থান মহাস্থানগড়ে এখনো এ ধরনের ঘরবাড়ি ব্যবহৃত হয়। উয়ারী-বটেশ্বর অঞ্চলে সাম্প্রতিক উৎখননে উক্ত স্থানে অনেক মাটির ঘরের চিহ্ন ছাড়াও ইটের স্থাপত্য পাওয়া যাচ্ছে।

৫) উয়ারী-বটেশ্বর এলাকা প্রাকৃতিক ও কৃত্রিম উভয়ভাবেই সংরক্ষিত। উপমহাদেশের আদি-ঐতিহাসিক সময়ের বসতিসমূহের প্রধান বৈশিষ্ট্য শক্তিশালী প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা। উয়ারী-বটেশ্বরের উত্তর ও পূর্ব প্রান্ত নদী দ্বারা সুরক্ষিত। দক্ষিণ ও পশ্চিম প্রান্ত অসম রাজার গড় দ্বারা সুরক্ষিত। অসম রাজার গড় সোনারুতলায় কয়রা নদীকে স্পর্শ করে শুরু হয়েছে এবং আড়িয়াল খাঁ নদীকে স্পর্শ করে আমলাবোতে শেষ হয়েছে। সাম্প্রতিক গবেষণায় দেখা যায় যে গড়ের বাইরে পরিখা ছিল।

৬) দুর্গের বেশ কিছু অংশে মাটির দুর্গ-প্রাচীর শনাক্ত করা যায়। উপমহাদেশে অন্যান্য স্থানেও আদি-ঐতিহাসিক কালপর্বের মাটির দুর্গ প্রাচীর পাওয়া যায়।

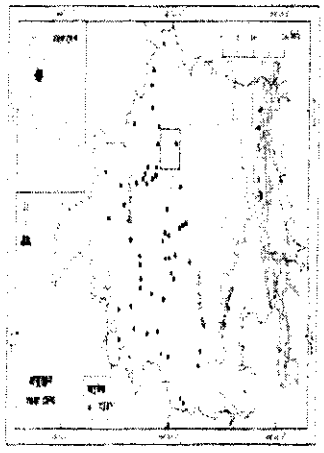

মানচিত্র ৪

মানচিত্র ৫

পরিশেষে বলা যায় যে, উয়ারী-বটেশ্বর অঞ্চলে প্রাচীন মানুষ বসতির জন্য বন্যামুক্ত ভূমি নির্বাচন করেছিল যার নিকটে ছিল নদী এবং বিল। এ ধরনের বসতি স্থান নির্বাচন তাদের অভিজ্ঞতা ও বুদ্ধিমত্তার পরিচয়সহ। তারা বন্যার মতো প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলায় এবং প্রাকৃতিক সম্পদ আহরণে যথেষ্ট দূরদর্শিতার পরিচয় দিয়েছিল।

প্রাক-মধ্যযুগে বাংলায় নগর: বাংলার প্রাচীন নগরগুলির সূচনা, বিকাশ ও অবক্ষয়ের কার্যকারণ নিয়ে গবেষকদের মধ্যে মতপার্থক্য থাকলেও একটি বিষয়ে অনেকে একমত যে আদি-ঐতিহাসিক যুগের নগরায়নের সঙ্গে গুপ্ত, গুপ্ত-পরবর্তী ও পালসেন যুগের নগরায়নের চরিত্রে একটা মৌলিক পার্থক্য রয়েছে। নীহাররঞ্জন রায়ের মতে আদি ঐতিহাসিক যুগের নগরগুলি গড়ে উঠেছিল ব্যাপক বাণিজ্যিক যোগাযোগ ও সমৃদ্ধি ভিত্তি করে। অন্যদিকে মধ্যযুগের গোড়ায় (প্রাক-মধ্যযুগ) শহর বলতে প্রধানত শাসনকেন্দ্র বা সামরিক কেন্দ্রকেই বোঝায়। অনেক গবেষকের মতে প্রাক-মধ্যযুগের শহরগুলোর মূল চরিত্র ছিল ধর্মকেন্দ্রিক ও অ-বাণিজ্যিক। কেউ কেউ বলেন প্রাক-মধ্যযুগের রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা শাসনকেন্দ্র গড়ে ওঠার উপযুক্ত ছিল না। গুপ্ত পরবর্তী যুগের শিলালিপিতে 'জয়স্কন্ধাবার' বা বিজয় শিবিরের বর্ণনা পাওয়া যায়। প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন বিশ্লেষণ করে আর এস শর্মা দেখান যে প্রথমবার ৩ শতকের পরে এবং দ্বিতীয়বার ৬ শতকের পরে সমগ্র উপমহাদেশে নগর অবক্ষয় ঘটে। গুপ্তযুগকে এ দুটি পর্যায়ের পর্বান্তর বলা হয়। কেননা গুপ্তযুগে উত্তর প্রদেশের পূর্বাঞ্চলীয় স্থানগুলোতে এবং বিহারে নগর জীবন তখনও টিমটিম করে চলছিল। নগর-অবক্ষয় প্রসঙ্গে তিনি বলেন মুদ্রার স্বল্পতা, বাণিজ্যিক সিলমোহর, মুদ্রা তৈরির ছাঁচ ও ঝিনুক, শঙ্খ, হাতির দাঁতের কাজ, পোড়ামাটির শিল্পকর্ম প্রভৃতি যা প্রাচীন যুগে ব্যাপকভাবে তৈরি হতো এ সময় তাদের ব্যবহার হ্রাস পায়। এমনকি লোহার ব্যবহার কমে যায়। ব্রোঞ্জ প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হতো কিন্তু তা কেবল ধর্মীয় কাজকর্মে ব্যবহৃত হতো। নগর অবক্ষয় যুগে ঘরবাড়ির হতশ্রী দশা হয়। যদিও কোনো কোনো প্রত্নস্থানে ধর্ম মন্দির বা প্রশাসকের জন্য নির্মিত বড় আকারের স্থাপত্য পাওয়া যায়, তবু আর. এস. শর্মার মতে শুধু স্থাপত্যকর্ম নগর জীবনের পরিচয়বহ নয়।

অনেকের দাবি মহাস্থান, বানগড়, মঙ্গলকোট ও চন্দ্রকেতুগড় প্রত্নস্থানে আদি-ঐতিহাসিক যুগে যে নগরায়ন শুরু হয়েছিল তা গুপ্ত ও পাল সেন যুগ পর্যন্ত চলেছিল। কোনো কোনো ক্ষেত্রে আবার নতুন নতুন শহর গড়ে ওঠে যেমন - রাজবাড়ি ডাঙ্গা ও গোস্বামীকান্দা। বিজয় কুমার ঠাকুরের মতে প্রাক-মধ্যযুগের রাজবাড়ি ডাঙ্গা, গোস্বামীকান্দা ও বানগড় ধর্মীয় বসতি তবে অ-বাণিজ্যিক নগর ছিল। তাঁর মতে উপর্যুক্ত প্রত্নস্থানের বড় বড় স্থাপত্যকীর্তি নগরায়নের স্বাক্ষ্যবহ। উপরন্তু প্রাক-মধ্যযুগের লিপি ও সাহিত্য নগর ও নগর জীবনের কথা বলে। পাল যুগের সাহিত্যে বর্ণিত এরকম একটি আদর্শ নগরী রামাবতী। বিভিন্ন সূত্রে প্রাক-মধ্যযুগের দেব পর্বত ও বিক্রমপুরের (নগর?) কথা বলা হয়। বিক্রমপুর জায়গাটি পরিচিত (মুন্সিগঞ্জ জেলা) হলেও সেখানে প্রত্নতাত্ত্বিক অনুসন্ধান বা খনন এখনো হয়নি। দেব পর্বত প্রত্নস্থানটি ময়নামতি অঞ্চলে অনুমিত হয়।

পশ্চিমবঙ্গের মুর্শিদাবাদের রাজবাড়ি ডাঙ্গা প্রত্নস্থানটিকে ৭ শতকের শশাঙ্কের রাজধানী কর্ণ-সুবর্ণ মনে করা হয়। স্থাপত্যিক কাঠামোর বিবেচনায় ব্রজ দুলাল চট্টোপাধ্যায় রাজবাড়ি ডাঙ্গাকে প্রাক-মধ্যযুগের নগর মনে করেন, তবে এখানে নগরের অন্যান্য প্রত্নতাত্ত্বিক সাক্ষ্য জোরালো নয়। উৎখননকারী এস.আর.দাসও এর প্রত্নতাত্ত্বিক সমৃদ্ধির কথা সুনির্দিষ্ট করে বলতে সক্ষম হননি। পাহাড়পুর বিহারকে (সোমপুর বিহার) জোরালো প্রত্নতাত্ত্বিক সাক্ষ্য ছাড়াই অমিতা রায় নগর বলেছেন। কুমিল্লার ময়নামতির ৭টি বৌদ্ধবিহার, একাধিক স্তূপ ও একটি হিন্দু মন্দির এবং ৪০টির বেশি প্রত্নস্থান ও অসংখ্য প্রত্নবস্তু নগরের সাক্ষ্য বহন করে। সাত শতকের চৈনিক পরিব্রাজক হিউয়েন সাং সমতট অঞ্চলে ৩০টি বৌদ্ধবিহার দেখেছিলেন। বৌদ্ধধর্মের সঙ্গে নগরায়নের একটি সম্পর্ক রয়েছে। প্রাক মধ্যযুগে ময়নামতি অঞ্চল একটি শিক্ষা শহর বা আবাসিক বিশ্ববিদ্যালয় শহর ছিল বলে ধারণা করা যায়। কারণ প্রাচীন যুগে বৌদ্ধবিহারগুলো আবাসিক বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো কাজ করত।[৬৭]

---

[৬৭] সুফি মোস্তাফিজুর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫১১।

গ্রিক দার্শনিক প্লেটো অথবা এরিস্টোটলের লেখায় এবং অন্যান্য ইউরোপীয় সাহিত্যে গ্রিক নগর রাষ্ট্রের যে ধরন উল্লেখ করা হয়েছে, বাংলার নগরগুলির প্রকৃতি ও শাসন কাঠামো সে রকম ছিল না। গ্রিক নগর রাষ্ট্রের সাথে প্রাচ্যের নগরগুলোর পার্থক্য বুঝা যায় প্লেটোর রিপাবলিক গ্রন্থের বর্ণনায়। সেখানে উল্লেখ করা হয়েছে :

> *প্রাচীনকালে সভ্যতাসমূহের বিকাশ ঘটেছিল সমুদ্র এবং নদীতীরে। ভূমধ্য সাগরের তীরবর্তী অঞ্চলে গ্রিক উপদ্বীপে এই জনবসতি পাহাড় পর্বত অধ্যুষিত ... প্রাকৃতিক চরিত্রের কারণে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নগর রাষ্ট্রের রূপ লাভ করে। গ্রিক সভ্যতা বিকাশের সময়ে এবং তারও পূর্বে মিশর, সিরিয়া এবং প্রাচ্যে ভারতবর্ষে এবং চীনে সভ্যতা বিকাশ লাভ করে। কিন্তু উত্তর আফ্রিকা, মধ্যপ্রাচ্য বা প্রাচ্য অঞ্চলে রাষ্ট্রের রূপ সমতলের বিস্তারের কারণে ক্ষুদ্র নগর রাষ্ট্রের পরিবর্তে বৃহদায়তন রাষ্ট্রের আকার গ্রহণ করে। ... ক্ষুদ্রায়তন গ্রিক নগর রাষ্ট্রগুলো বৃহৎরাষ্ট্রের তুলনায় এক একটি ক্ষুদ্র শহর প্রায় ছিল, ... যথার্থভাবে যারা এথেন্সের নাগরিক ছিল তাদের সংখ্যা ছিল খুব কম ... (তারা) গোষ্ঠীবদ্ধভাবে বাস করত। তাদের পারস্পরিক সম্পর্ক ছিল ঘনিষ্ঠ এবং প্রত্যক্ষ। প্রাচীন এথেন্সে প্রত্যক্ষ গণতন্ত্র বিকাশের এটাই ছিল পটভূমি।*[৬৮] *(করিম, ১৯৭৪: পৃ. ২১-২২)।*

বুঝতে অসুবিধা হয় না প্রাকৃতিক ও ভৌগোলিক কারণে গ্রিসে একেকটি নগর একেকটি স্বয়ংসম্পূর্ণ (নগর) রাষ্ট্র হিসেবে গড়ে ওঠে। কিন্তু আমাদের দেশের নগরগুলো ছিল একেকটি কেন্দ্র যা বিশাল রাষ্ট্র বা সাম্রাজ্যের শাসনতান্ত্রিক, বাণিজ্যিক, সামরিক ও অন্যান্য প্রয়োজনে গড়ে ওঠা ক্ষুদ্র ও পরিপূরক অংশ হিসেবে গড়ে ওঠে।

---

[৬৮] সরদার ফজলুল করিম, প্লেটোর রিপাবলিক, বর্ণ মিছিল, ঢাকা ১৯৭৪, পৃ. ২১-২২।